ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভয়ের আড়ালে ভয়

১

জগুমামা যাচ্ছেন বস্টনের হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে। মার্কিন-প্রবাসী বন্ধু ডঃ প্রাণতোষ দেব ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এয়ারপোর্টে নামার পর থেকে প্রাণতোষকে আর ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না।...তারপর?

প্রাণতোষ দেব হসপিটালাইজড্? সিভিয়ার হার্ট অ্যাটাক? তাঁর বন্ধ বাংলোয় কীসের গন্ধ?...তারপর...?

২

তাওয়াং জঙ্গলে প্রফেসর থুপতেন নরবু গাছ-গাছড়া নিয়ে কী রিসার্চ করছিলেন? লোকাল প্যান্ট-কালেকটররা গায়েব হয়ে গেল কেন?...জগুমামা-টুকলুর গাড়ি হঠাৎ অচল! রাতের আঁধারে পাহাড়ে কারা অ্যাটাক করল?...সুস্থসবল নরবু হঠাৎ ছটফট করতে-করতে মারা গেলেন! শরীরে কোনও বিষক্রিয়া নেই?...

পৃথিবীর দুই গোলার্ধে ছড়ানো দুটি রহস্য-ভয়াল কাহিনি।

ভয়ের আড়ালে ভয়

প্রতিদিন যাঁর অফুরন্ত
সান্নিধ্য ও স্নেহে সমৃদ্ধ হই

সমরেশ মজুমদার

একান্ত শ্রদ্ধিতেষু

সূ চি প ত্র

অন্ধকার ভালো নয় ১১

ভয়ের আড়ালে ভয় ৭৫

১

উ...হুর...স্...টার! উহুঁ, ঠিক হল না। হু...উ...রস...টার! নাহ্! উর...র...সেটার! ধ্যুৎ, বহুত ভজকট, গুলিয়ে যাচ্ছে। উচ্চারণটা হবে উ...উ...উ...উ...স্...টার!...উ...উ...উ...র্স...

দোতলায় উঠতে-উঠতে অনন্ত সরখেলের গলা কানে এল। বাঁ-দিকে ঘুরে দেখলাম, বারান্দায় উনি পায়চারি করছেন, দাড়ি চুলকোচ্ছেন আর মুখ দিয়ে নানারকম বিদ্‌ঘুটে ধ্বনি বেরিয়ে আসছে।

—উঃ...হুঃ...র...র...র...স্...

—কী হল? পাগল হয়ে গেলেন নাকি?

অনন্তবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন। বিকৃতগলায় বললেন, এখনও হইনি। তবে শিগগিরই হয়ে যাব। ওফ্-ফ্! কী নাম রে বাবা। কিছুতেই হচ্ছে না।

—কীসের নাম?

—একটা শহরের।

—বানান বলুন।

—ডব্লু ও আর সি ই এস টি ই আর।

—ভেরি সিম্পল। ওরসেস্টার।

—তোমার মুণ্ডু! বাছা, ওটাই তো গ্যাঁড়াকল। বানানের সঙ্গে মিল থাকলে তো হয়েই যেত। স্যার বললেন, উচ্চারণটায় মাঝের অংশ বাদ। হবে উ-উ-উ...

—দাঁড়ান, দাঁড়ান। উচ্চারণ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন বলুন তো?

—ঘামাচ্ছি কি আর সাধে রে ভাই? স্যার সাফ বলে দিয়েছেন,

জায়গাটার নাম ঠিকঠাক বলতে না পারলে নিয়ে যাবেন না।

—নিয়ে যাবেন না! কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

—ওই যে বদ্‌খত নামের শহরটায়। উঃ-উ-উ—

—আরে! জায়গাটা কোথায়? কখন যাওয়া ঠিক হল? আমি সকালে অফিসে যাওয়ার সময়েও—

—না-না, এই আধঘণ্টা আগে ফাইন্যাল হয়েছে। স্যারের কাছে ফোন এল।...এক্‌মিনিট। আমায় একটা জিনিস ক্লিয়ারফাই করে যাও তো!

—ক্লিয়ারফাই? ওহ্, মাই গড! অনন্তবাবু, কথাটা হচ্ছে ক্লারিফাই। বলুন, কুইক।

—ওই শহরটার নামে একট 'সস' আছে না? সস বুঝছ তো? খাবারের সঙ্গে দিয়ে খায়। বড়-বড় হোটেলের টেবিলে দেওয়া থাকে।

—ধ্যুৎ! সে তো ওয়েস্টার সস। থাই, চাইনিজ রেস্তোরাঁয় দেয়। শামুক থেকে বানায়। আরেকরকম কন্টিনেন্টাল সসও হয়। উরস্টারশায়ার সস।

বলতে-বলতে অনন্তবাবুকে ছেড়ে আমি সোজা জগুমামার ঘরে।

এই যে টুকলু।—জগুমামা হেসে বললেন, তোর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। তোর পাসপোর্টটা দে। ডিটেলটা সঞ্জয়-টিনাকে আজই মেইল করে দেব। সময় খুব কম। মাত্র একুশদিন।

—একুশদিন! কী ব্যাপার বলো তো মামা? সত্যি-সত্যিই কোথাও যাওয়া হচ্ছে নাকি?

—হ্যাঁ রে। একরকম ফাইন্যাল হয়ে গেছে। সব ঠিকঠাক চললে তোদের নিয়ে একবার স্যামচাচার দেশে ঘুরে আসা যাবে।

—স্যামচাচা! মানে অ্যাম্যারিকা! কোথায়? হঠাৎ?

—হঠাৎ নয় রে। বেশ কিছুদিন ধরে ই-মেলে যোগাযোগ চলছিল। আজই, কিছুক্ষণ আগে ব্যাপারটা ম্যাচিওর করল। প্রাণতোষ কনফার্ম করল। তারপর অফিসিয়াল লেটারও এল। হার্ড কপি ক্যুরিয়ার করে দিচ্ছে। দু-একদিনের মধ্যে এসে যাবে।

—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রাণতোষ কে?

—তুই ঠিক চিনবি না। আমার প্রেসিডেন্সির ব্যাচমেট। প্রায় পঁচিশ

মোটামুটি ফাইনাল হয়ে গেল। ওরা যে শহরে থাকে, তার নামটা এখনও অনন্তবাবু প্রপারলি উচ্চারণ করতে পারেননি। চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

তোরা আমেরিকা যাচ্ছিস?—মা'র মুখ হাঁ হয়ে গেল, কবে যাবি?

—এই মাসের শেষে। এখন ওখানে সামার। চমৎকার ক্লাইমেট।

—কতদিনের জন্যে যাচ্ছিস? টুকলু অফিসে ছুটি পাবে তো?

—সেটা ওর ব্যাপার। ম্যানেজ করতে হবে। পনেরো দিনের কম নয়। তুমি টিনা-সঞ্জয় আর ওদের মেয়ে তৃষার জন্যে কী-কী দেবে, লিস্ট করে কিনে ফেলো। দেখতে-দেখতে দিন চলে যাবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। কালকেই বেরোব। শুনছ, অ্যাই পিকলু,—বলতে-বলতে মা উত্তেজিতভাবে বেরিয়ে গেলেন, জগু, টুকলু, অনন্তবাবু আমেরিকা যাচ্ছে। টিনাদের ওখানে। পিকলু দ্যাখ, তুই কানাডায় চান্স পেয়েও গেলি না, আর দাদা এবার ঘুরে আসবে!

এবার মায়ের সবাইকে ফোন করা শুরু হয়ে যাবে।

অনন্তবাবু চেয়ারে বসে প্লেট টেনে নিয়ে 'মাল' সাফা করতে শুরু করে দিয়েছেন।

—মামা, তার মানে আমরা ইস্ট কোস্টে যাচ্ছি?

—হ্যাঁ রে। নিউ ইয়র্ক, বস্টন, ঊরস্টার সবই অ্যাম্যারিকার পূর্ব উপকূলে।

—ওয়েস্ট কোস্টে যাব না?

—না রে। মনে হয়, হবে না। দেশটা এত বড়, ইস্ট থেকে ওয়েস্ট প্লেনে যেতে লাগে ছ'ঘণ্টা। বাই রোড তিন থেকে চার দিন। একই দেশের দুই উপকূলে এক ঘণ্টার টাইমের ফারাক। মার্কিন দেশ ভালোভাবে চিনতে হলে অন্তত বারপাঁচেক বেশ ভালোমতো সময় নিয়ে যেতে হবে।

—স্যার, আপনি কবার গেছেন?

—খুব বেশি যাইনি। বারতিনেক। একবার ওয়েস্টে, ক্যালিফোর্নিয়া য়ুনিভার্সিটিতে লেকচার দিতে। বাকি দুবারেই ইস্টে। সায়েন্স কনফারেন্সে। তখন আপনাদের সঙ্গে নেওয়ার সুযোগ ছিল না।

—মামা, আমাদের কি নিউ ইয়র্ক হয়ে যেতে হবে?

—যেতে হবে নয়, আমরা যাব। বস্টনেও ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। কিন্তু আমার ইচ্ছে, তোদের একবার জে এফ কে এয়ারপোর্ট দেখাব। কী বিশাল যে হতে পারে, দেখবি। হিথরো তুই দেখেছিস। তার চেয়েও বড়। মিনিটে দশটা প্লেন উঠছে-নামছে। নিউ ইয়র্কে যাওয়ার আরেকটা সুবিধে, কলকাতা থেকে ডাইরেক্ট ফ্লাইট। কলকাতা-দিল্লি-নিউ ইয়র্ক। তারপর নিউ ইয়র্ক থেকে গ্রে হাউন্ড বাসে উরস্টার যাওয়া...দেশটা দেখতে-দেখতে যাবি। চাইলে একরাত নিউ ইয়র্ক থেকেও যেতে পারিস।

—ওখানে তোমার চেনা আছে?

—থাকবে না? শ্যামা আছে, মৌসুমি-কাজল আছে। কোনও ব্যাপারই না।

পিঁপ্-পিঁপ...বিছানার ওপর কর্ডলেস ফোনটা বাজছে। মামা অন করলেন।

—হ্যালো। ইয়েস, স্পিকিং। প্রাণতোষ? হ্যাঁ, বলো।...তোমার মেইল পেয়ে রিপ্লাইও করে দিয়েছি। দেখে নাও। হাভার্ডকেও করে দিয়েছি। ওদের মেইলটা তোমায় কপি করেছি।...হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ঠিক থাকলে কনফার্মড যাচ্ছি।...না, না, ঠিক বলতে সঙ্গে আমার ভাগ্নে আর কম্প্যানিয়ন থাকছে। আমায় একা ছাড়বে না। ওদের ভিসা এইসব... না-না, চিন্তা কোরো না। আমি তোমায় আমাদের ট্যুর আইটিনারিও পাঠাচ্ছি। সেইসঙ্গে লেকচারে কী-কী ইক্যুইপমেন্টস লাগবে, জানিয়ে দেব...দু-চারদিনের মধ্যে।...হার্ড কপি পেয়ে গেলে ভিসা অ্যাপ্লাই করছি। ডোন্ট ওরি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এয়ার টিকিট কেটে নিচ্ছি।...ও.কে.।

২

আমার ঠিক সামনের কাউন্টারে অনন্ত সরখেল। ওর ঠিক পিছনে আমি। জগুমামার ইমিগ্রেসন হয়ে গেছে। ওধারে দাঁড়িয়ে আছেন।

কাউন্টারে পুরুষালি মুখের এক ভদ্রমহিলা। চোখদুটো বেশ ট্যারা।

—হাই মিস্টার!

অনন্তবাবু হাসিমুখে তাকিয়ে।

—হাই মিস্টার সরখেল! আয়াম টকিং টু য়ু।

অনন্তবাবু ধড়ফড় করে উঠলেন, সরি, সরি ম্যাডাম। আই নট আন্ডারস্ট্যান্ড। ইয়োর আই...ইয়ে...

—য়ু আর কামিং ফ্রম?

—কলকাতা। ইন্ডিয়া।

—ফর ওয়াট?

—সার্ভেন্ট।

—ওয়াট! সার্ভেন্ট?

খেয়েছে! এত করে বলা হল কমপ্যানিয়ন বলতে, আসল জায়গায় ভুলে গেল!

ইয়েস।—অনন্তবাবু, দমবার পাত্র নয়। বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, আই কাম টু হেল্প ডক্টর মুখার্জি, সায়েন্টিস্ট। আন্ডারস্ট্যান্ড?

—মিস্টার সরখেল, দ্যাট মিনস কমপ্যানিয়ন। ও কে। হাউ মেনি ডেইজ য়ু ওয়ান্ট টু স্টে হিয়ার?

—দ্যাট আই নট নো। মাই বস ডক্টর মুখার্জি। হি...যতদিন মানে...অ্যাজ লং হি স্টে, আই স্টে। প্লিজ সি, হি স্ট্যান্ডিং দেয়ার। স্যার, স্যার!

—প্লিজ স্টপ শাউটিং। নো নিড্।

ভদ্রমহিলা আর কথা বাড়ালেন না। অনন্তবাবুর ভিসায় ফর্ম সেঁটে স্ট্যাম্প মেরে দিলেন। পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে দিলেন। তারপর স্পষ্ট শুনলাম, বড় একটা শ্বাস ফেললেন। আমিও ফেললাম। যাক, ঢুকে গেছে ভিতরে।

আমাকেও দু-চারটে প্রশ্ন করলেন। তারপর পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে দিলেন।

সামনের বিশাল হলঘরে কনভেয়ার বেল্টে লাগেজগুলো ঘুরছে। জগুমামা ইতিমধ্যে আমাদেরগুলো নামিয়ে জড়ো করেছেন। অনন্তবাবু এদিকে না এসে অন্যদিকে সার-সার ট্রলিগুলো যেখানে রয়েছে,

সেখানে গিয়ে একটা ট্রলিকে লাইন থেকে বের করতে প্রাণপণে টানাটানি করছেন।

জগুমামা বললেন, ও অনন্তবাবু! ট্রলির দরকারটা কী? আমাদের লাগেজগুলোয় তো চাকা লাগানো আছে!

—না, স্যার। ভাবলুম, একটা পেলে মন্দ হত না। তার ওপর সব চাপিয়ে নিতুম।

—তাহলে পাঁচ ডলার ফেলুন। ওই ওপরের খোপে। ট্রলি বেরিয়ে আসবে। এদেশে বিনিপয়সায় কিস্যু হয় না।

অ্যাঁ!—ইলেকট্রিকের শক খাওয়ার মতো ট্রলি থেকে হাত সরিয়ে নিলেন অনন্তবাবু, এখানে ট্রলিতেও পয়সা? ডাকাতের দেশ মশাই!

একজিট লাউঞ্জ মোটামুটি ফাঁকা হয়ে গেছে। তিরচিহ্ন দিয়ে সব লেখা, কোন দিকে কী! মামা দেখে বললেন, বাঁ-দিক দিয়ে বেরোতে হবে। সিটি কার লেখা আছে।

একটি ফরসা বেঁটেমতন লোক আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। খাদাবোঁচা। মনে হচ্ছে চিন-কোরিয়া বা জাপানের। ব্ল্যাক ট্রাউজার, ব্ল্যাক টি-শার্ট। মাথার চুল, ভ্রূ সব সাদা। বয়েস ষাটের ওপরে নিশ্চয়ই। দু-হাতে ধরা, 'ডক্টর জগবন্ধু মুখার্জি'।

জগুমামার ভ্রূ কুঞ্চিত। অস্ফুটে বললেন, স্ট্রেঞ্জ! পিনাকী এল না?

—পিনাকী?

—হ্যাঁ। প্রাণতোষের ভাইপো। পরশু রাতে প্রাণতোষ ফোন করেছিল। তখনই পিনাকীর নাম জানলাম। বছরপাঁচেক এদেশে আছে। প্রাণতোষই এখানে নিয়ে এসেছে। য়ুম্যাসে রিসার্চ করছে। কাকার সঙ্গে। আমার নাম দেশে থাকতেই শুনেছে। নিজে থেকেই বলেছে, আমাদের রিসিভ করে প্রাণতোষের বাড়ি নিয়ে যাবে।

—উনি কি প্রফেসর দেবের বাড়ি থাকেন?

—বোধহয় না। প্রাণতোষ বলল, 'পিনাকী ঠিক ব্যবস্থা করে পৌঁছে যাবে। ও তোমাদের রিসিভ করার জন্যে এক্সসাইটেড হয়ে আছে। আমার কাছে তোমার কথা এত শুনেছে।' এত কথা হল! যাগ্যে, চল।

লোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন জগুমামা, হাই। দিস ইজ জগবন্ধু।

—হাই জাগাবন্দু। ওয়েলকাম। দিস ইজ রবার্ত। কাম, কাম।

রবার্ট হেসে আমাদের ইশারা করল।

একটু দূরে সারি-সারি গাড়ির পার্কিং। রিমোট দিয়ে রবার্ট একটা বড় গাড়ি খুলল। পিছনে আমাদের লাগেজ ঢোকালাম।

—টুকলু, এদেশে সব উলটো। ডানদিক দিয়ে গাড়ি চলে, বাঁ-দিক দিয়ে আসে। ড্রাইভিং সিটও উলটো।...আমি সামনে বসছি।

গাড়ি স্টার্ট করল। তার আগেই আমরা সিট বেল্ট বেঁধে নিয়েছি। একবার ব্যাক করল, তারপর ডানদিকে ঘুরে সোজা মেইন রোডে।

—মামা, এদের গিয়ার নেই?

—না। এদেশে সব গাড়ি অটোগিয়ার। এরা বলে স্টিক। একটাই স্টিক আছে, ব্যাক করার জন্যে। স্রেফ অ্যাকসিলেটর আর ব্রেক।

গাড়ি ফাঁকা রাজপথের ডানদিকে দিয়ে ছুটছে। হাঁ হয়ে দেখছি। কিছুদূর অন্তর রাস্তার ওপরে সবুজরঙা রোড ডিরেকশন, কোন দিকে গেলে কোন এলাকা। ফ্লাইওভারের পর ফ্লাইওভার। কোনও কিলোমিটারের ব্যাপার নেই, এখানে সব 'মাইল'। মাঝে-মাঝে আকাশচুম্বী অট্টালিকাগুলির চুড়ো দেখা যাচ্ছে।

—টুকলু, তোর ফোনটা চালু করেছিস?

—হ্যাঁ। কেন?

—একবার প্রাণতোষকে ধর তো। চিন্তা হচ্ছে। সে এল না, তাঁর ভাইপো পিনাকীও এল না।

ফোনে নাম্বার খুঁজতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ! সর্বনাশ! মোবাইলের ব্যাটারি মাত্র এক দাগ। এখনই চার্জ দেওয়া দরকার। নতুবা অফ হয়ে যাবে।

প্রাণতোষ দেবের মোবাইলে ফোন করছি। হ্যাঁ, বাজছে।

—মামা, এই নাও।

মামা কানে দিলেন। ধরে রইলেন। তারপর পিছনে হাত বাড়িয়ে ফেরত দিলেন, না রে। বেজে-বেজে কেটে গেল। নো রেসপন্স।

—হয়তো এখনও ঘুম থেকে ওঠেননি। সানডে মর্নিং।

—না রে। প্রাণতোষ খুব ডিসিপ্লিন্‌ড। সপ্তাহের সব দিনে একই রুটিন। দশটায় বিছানায় যায়, ভোর ছটায় উঠে পড়ে। এখন সাতটা বেজে গেছে।...রবার্টের কাছে পিনাকীর ফোন নাম্বার থাকতে পারে।...হাই রবার্ট! রবার্ট!

রবার্ট গাড়ি চালাতে-চালাতে মুখ ঘুরিয়ে ফিক্ করে হাসল।

—রবার্ট! ডু য়ু হ্যাভ পিনাকীস ফোন নাম্বার?

রবার্ট হাসল। দুবার মাথা দোলাল। কোনও জবাব দিল না।

লোকটা কি ইংরেজি বুঝতে পারছে না? মামা আবার জোরে-জোরে বললেন, রবার্ট! রবার্ট! পিনাকী—পিনাকী—?

রবার্ট আবার একটু দুলল, হাসল। তারপর বাঁ হাত দু-কানে দেখাল।

মামা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, বুঝলি, কী বলতে চাইল? ও কানে শুনতে পায় না। আমাদের আগেই বোঝা উচিত ছিল। কানে মেশিন গোঁজা। গাড়িতে ওঠার সময় নজর করিনি।

—তাহলে কী করণীয়?

—কিছুই করার নেই। পিনাকী পাঠিয়েছে ওকে। সুতরাং আশা করা যায়, গন্তব্যস্থল চেনে।

টুকলু দ্যাখো, দ্যাখো!—অনন্তবাবু এতক্ষণ জবুথুবু হয়ে ঝিমোচ্ছিলেন। হঠাৎ জেগে উঠেছেন।

—স্যার, এটা সমুদ্র, না?

—সমুদ্র বলতে পারেন, নদীর মোহনাও বলতে পারেন। নিউ ইয়র্ক শহরটা কয়েকটা দ্বীপ নিয়ে ছড়ানো। এটা সম্ভবত ইস্ট রিভারের কনফ্লুয়েন্স। আমরা এই ব্রিজ পেরিয়ে নিউ জার্সি স্টেটে ঢুকছি।...ওইদিকে তাকান। নিউ ইয়র্কের স্কাইলাইন। ওই যে স্ট্যাচু অব লিবার্টি।

কী বিশাল ব্রিজ! এ কি মানুষের তৈরি? বহু নীচে নীল ফেনিল জলরাশি। পিঁপড়ের মতো দেখাচ্ছে স্টিমারগুলোকে। একপাশ দিয়ে রেললাইন। নীচে আরেকটা ব্রিজ, সেটা কোথায় যাচ্ছে, কে জানে!

ডানদিকের দিগন্ত জুড়ে দেশলাইয়ের মতো বহু-বহুতল অট্টালিকার সারি। অতলান্তিক সাগর লুটোপুটি খাচ্ছে তাদের গায়ে। সাগরের বুকে

হাত তুলে সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যাচু অব লিবার্টি।

দু-চোখ ভরে দেখছি। কিন্তু মনটাও খচখচ করছে।

—মামা, একটা কথা বলব?

—বল।

—ঠিকঠাক যাচ্ছি তো আমরা? প্রাণতোষবাবু ফোন ধরছেন না। পিনাকীর কোনও ট্রেস নেই। ও পাঠিয়েছে ভেবে যে গাড়িতে আমরা চড়ে বসেছি, তার ড্রাইভার রবার্ট বদ্ধকালা। তার সম্পর্কে কিছুই জানি না। পুরো ব্যাপারটা তোমার সন্দেহজনক লাগছে না?

টুকলু রাইট স্যার।—অনন্ত সরখেল সিধে হয়ে বসেছেন, খুবই সন্দেহজনক, গ্রেটলি সাসপেক্টিং স্যার। গাড়িটা থামাতে বলুন স্যার, নেমে পড়ি।

নেমে পড়বেন?—মামা নিরুত্তাপ গলায় বললেন, নেমে কোথায় যাবেন? এই হাইওয়েতে জানেন, কী হয়? দিনদুপুরে হঠাৎ একটা গাড়ি এসে দাঁড়াবে। তিন-চারজন ছ'ফিট তিন ইঞ্চি নামবে। হাতে রিভলভার। যা আছে, সব নিয়ে শুধু আন্ডারওয়্যার পরিয়ে ছেড়ে দেবে।

—ওরে ব্বাপ্‌স! জয় মা, জয় মা!

—কোনও মা-বাবা বাঁচাবে না।...টুকলু, তুই যা বলছিস, আমি তার চেয়ে অন্যকিছু ভাবছি না। তবে এদেশের রাস্তাঘাট যেটুকু মনে আছে, মনে হচ্ছে এখনও ঠিক পথেই যাচ্ছি। বাকিটা দেখা যাক। সেকেন্ড অপশন না পেলে হুটহাট কিছু করা যাবে না।

আবার সব চুপচাপ। রোবটের মতো গাড়ি চালাচ্ছে রবার্ট। আমাদের কোনও কথা নিশ্চয়ই তার কানে ঢুকছে। না। ঢুকলেও বোঝা সম্ভব নয়।

স্পিডোমিটারের কাঁটা পঁচাত্তর-আশি মাইলের ঘরে। তার মানে একশো ত্রিশ কিলোমিটার। গাড়ি একটুও নড়ছে না। অবাক হয়ে ভাবছি, এ কোন দেশে এসে পড়লাম? অজগরের মতো আঁকাবাঁকা পাঁচ-ছয় লেনের বিরাট চওড়া হাইওয়ে, কখনও নীচে, কখনও ওপরে। কখনও কাটাকুটি খেলছে ফ্লাইওভারের সঙ্গে। কখনও দুধারে সবুজ

পাহাড়, কখনও গভীর বন। নীল টলটলে আদিগন্ত লেক। মাঝে-মাঝে গ্যাস অর্থাৎ পেট্রল পাম্প। তাদের সঙ্গে ম্যাকডোনাল্ড, উইনডিস বা ডোনাট-ডানকিনের ধাবা।

এদেশ কি মানুষই বানিয়েছে, না কোনও ময়দানব বা বিশ্বকর্মা এসে করে দিয়ে গেছে?

দুদিক দিয়েই কতরকমের গাড়ি যাচ্ছে হুসহুস করে। অনেক গাড়িই আবার হুড খোলা। কয়েকটা গাড়ির পিছনে আবার 'টো' করা আছে আস্ত একখানা বোট। তার ওপরে বড় হুইল ছিপ।

—দেখেছিস? সি বিচে যাচ্ছে। বোটিং করবে, ফিশিং করবে।

মাঝে-মাঝে দানবাকৃতি বাসকে ওভারটেক করছে রবার্টের গাড়ি। একটু আগেই চোখে পড়েছে সবুজ বোর্ডে লেখা, ওয়েলকাম টু কানেকটিকাট। আমরা যাচ্ছি কানেকটিকাট রাজ্য দিয়ে।

—এদের একেকটা প্রভিন্সে একেকটা নিজস্ব নিয়ম। স্বাধীন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। কেউ কারও স্বাধীনতায় হাত দেয় না। আবার সব মিলিয়ে ইউনাইটেড স্টেটস অব অ্যাম্যারিকা। এখন মোট পঞ্চাশটা স্টেট।

—মনে হয়, এরা যেন সারা পৃথিবীর সম্পদ এনে জড়ো করেছে।

—অ্যাকচুয়ালি তাই-ই। নিজের দেশের লোককে এরা যা আরামে রাখে, আমরা ভাবতেও পারি না! সাধে কি আর খিদের জ্বালায় গরিব দেশ থেকে লুকিয়ে-চুরিয়ে, এমনকী বেগার খাটতেও এদেশে আসতে চায় মানুষ!

গলা বেশ শুকিয়ে এসেছে। চা বা কফি পেলে ভালো হত। কিন্তু কাকে কী বলব? রবার্টের কোনও অনুভূতি আছে বলে মনে হচ্ছে না।

পাশ দিয়ে এর মধ্যেই নানা নামের অসংখ্য ছোট-বড় জনপদ পেরিয়ে যাচ্ছি। সামনে বোর্ডে দেখাচ্ছে 'হার্টফোর্ড'।

—মামা, রবার্টকে একবার থামাতে বলবে নাকি? না বুঝলে, ঠেলা দিয়ে, ইশারায়—।

কিন্তু তার দরকার হল না। রবার্ট গাড়ির স্পিড একটু 'স্লো' করে

মামাকে বলল, সার, ব্রেকফাস্‌ত? ব্রেকফাস্‌ত?

—ইয়া, ইয়া।

ধড়ে যেন প্রাণ এল। প্রায় তিনঘণ্টা একটানা গাড়ি চলছে। তার আগে একটানা তেরো ঘণ্টা ফ্লাইট। শরীর আর টানছে না।

হার্টফোর্ডের একটু বাইরের দিকে বিরাট একটা ম্যাকডোনাল্ড। গায়ে গ্যাস স্টেশন। রবার্ট গাড়ি ঢুকিয়ে দিল।

মস্তবড় একটা ফলক পথের ওপর। সেখানে লেখা—মার্ক টোয়েন অ্যান্ড হ্যারিয়েট বিচার স্টো লিভড হিয়ার। দুই বিশ্ববন্দিত লেখক। সেই কতদিন আগে 'মার্ক টোয়েনের গল্প' আর 'আঙ্কল টম্‌স কেবিন' পড়েছি।

চমৎকার ব্যবস্থা। ম্যাকডোনাল্ডের বাইরে ঝকঝকে-তকতকে বেসিন। টয়লেট। সাইড ব্যাগ থেকে তোয়ালে বের করে নেমে পড়লাম।

অনন্তবাবু টয়লেটের ভিতরে। বেসিনে দাঁড়িয়ে চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছি। মামা একটা সিগারেট ধরিয়েছেন।

হঠাৎ অনন্তবাবু প্রায় ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। চোখেমুখে গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ।

—স্যার, স্যার! আমায় পাকিস্তানি সন্দেহ করছে!

'কে' বলার আগেই ওঁর পিছন-পিছন দুজন যুবক বেরিয়ে এল। তারা রীতিমতো হাসছে।

—হায় আল্লা! তাজ্জব মানুষ তো আপনি। একবার কইবেন তো বাঙালি, ইন্ডিয়ান! কাম শ্যাষ! আমরা কি পুলিশ নাকি?

—তাহলে ওই কথা বললেন কেন?

—কী কইরা বোঝব, কন দেখি? আপনের নূর-মোচ দেইখা ভাবলাম...ওয়ান সেক্—

বলতে-বলতে বক্তার ভ্রূ কুঁচকে গেছে। মামাকে ভালো করে দেখে সে বলল, আপনারে...আপনারে...বড় চেনা-চেনা লাগে...! কিছু মনে করবেন না, আপনি কি প্রফেসর জেবি মুখার্জি?

এবার জগুমামা অবাক। বেশ থতমত খেয়ে বললেন,—হ্যাঁ। আমার নাম জগবন্ধু। জগবন্ধু মুখার্জি।

সার, আপনি!—যুবকটি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, আপনি আমায় চেনবেন না সার। আমি দেইখাই চিনছি। আমি মিন্টু। আশরাফুল হক মিন্টু। দিল্লির জে. এন. ইউ-তে আপনার কাছে দু-বছর মাস্টার্স পড়ছিলাম। ঢাকা থেকে আমরা দুজন চান্স পাইছিলাম। আপনার বন্ধু মেছবাউদ্দিন আমেদ সার রেকমেন্ড কইরা পাঠায়ে ছিলেন। এইবার মনে পড়ছে সার?

মিন্টু, মিন্টু।—জগুমামার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, এবার একটু-একটু মনে পড়েছে। সে কী আজকের কথা! তখন ছিলে রোগাপাতলা, এখন তো গায়েগতরে বেশ মুটিয়েছ।

—জি সার। এদেশে আইলে রোগা থাকা মুশকিল। চলেন সার। ভিতরে চলেন।

৩

কোনও ওজর-আপত্তি টিকল না। মিন্টু আমাদের একটা টেবিলে বসিয়ে বন্ধুটিকে নিয়ে চলে গেলেন কাউন্টারে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুটো ট্রে ভর্তি জাম্বো স্যান্ডুইচ, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, পাঁচ গেলাস কফি আর দুবোতল জল এনে রাখলেন টেবিলে।

—এরেই কয় সার ভালোবাসার টান। সেই টানেই ইনশাল্লা, দেখা হইয়া গেল। কবে আসছেন?

—আজ সকালে। নিউ ইয়র্কে নেমেছি।

—যাইবেন কই?

—ঊরস্টারে।...মিন্টু, একটুও বাড়িয়ে বলছি না, তোমায় হঠাৎ পেয়ে মনে হচ্ছে, দেবদূত। অ্যাঞ্জেল। কেন, সেটা পরে বলছি।...তুমি কি এখানেই সেট্‌লড?

—জি সার। এদেশে বারো বৎসর হইয়া গেল। হার্টফোর্ডে নয় বৎসর।

—কোন কলেজে পড়াচ্ছ?

—না সার। লাইন চেঞ্জ হইয়া গেছে গিয়া। মেটলাইফ ইনসিওরেন্সের আমি সিটি ম্যানেজার। আসলে স্যালারিটা একটা বড় ফ্যাক্টর সার।

—সে তো বটেই। উনিও কি তোমার সঙ্গে—?

—না সার। অর নাম পলাশ। আমার পুরান দোস্ত। ঢাকা থিক্যা আসছে। মাইক্রোসফট্-এ আছে। আমি অরে নিয়া আশপাশ ঘুরাইয়া দেখাইতাছি।

—তোমার পরিবার এল না?

—না সার। আপনার বউমাও সার্ভিস করে। উইক-এন্ডে ঘরের অনেক কামকাজ থাকে। বাচ্চাটাও আছে। আমিও দ্যাখলাম, ভালোই হইল। দুই বন্ধুতে ফ্রি মতন ঘুরুম।

—কোথায়-কোথায় গেলে?

—কাল গেছলাম বস্টন। আজ যাব প্লাইমাথ। ওই যে যেখানে প্রথম—

—জানি। বুঝলি টুকলু, প্লাইমাথেই প্রথম য়ুরোপিয়রা এসে নোঙর ফেলে। ওয়ামপ্যানগ জাতের রেড ইন্ডিয়ানরা ওদের মেরে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ওরা ছাড়ার পাত্র নয়। সোনার দেশ ওদের তখন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ষোলোশো কুড়ি সালে ওরা 'মে ফ্লাওয়ার' জাহাজে করে ফের আসে। ছেষট্টি দিন সমুদ্রে ভেসে। ভাবতে পারিস? আজও সেই জাহাজটার একটা নকল বানিয়ে রেখে দেওয়া আছে। মিউজিয়ামে আছে। বন্দরটা আটলান্টিকের একটা খাঁড়ি। নাম দিয়েছিল 'কেপ কড বে'।...

মামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বুঝলে মিন্টু, আমাদের ট্যুর প্রোগ্রামে এই সব কিছুই ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হবে, জানি না।

—কেন সার? কী সমস্যা আমারে কন। কোনও চিন্তা করবেন না।

জগুমামা সংক্ষেপে লেকচারের ব্যাপারটা বললেন। তারপর বললেন, ঠিক ছিল বস্টনে লেকচার দিয়ে প্রাণতোষের ওখানে একদিন থেকে চলে যাব আমার বোন টিনাদের ওখানে। ওরা উরস্টারে থাকে। ওরা ঘোরাবে। কিন্তু আজ সকালে নামার পর থেকে মনে হচ্ছে, সব যেন

ওলটপালট হয়ে গেছে। প্রাণতোষের ফোন বেজে যাচ্ছে। পিনাকীর ফোন জানি না। যে ড্রাইভারকে পাঠিয়েছে, সে বদ্ধকালা। আমরা ঠিক জায়গায় যাচ্ছি কিনা, তাও বুঝতে পারছি না।

—ড্রাইভার কি নিউ ইয়র্কের? না ঊরস্টার থেকে আসছে?

—মনে হচ্ছে নিউ ইয়র্কের। গাড়ির নাম্বার প্লেটে 'এম্পায়ার স্টেট' লেখা।

—হুঁ। ওটা নিউ ইয়র্কের। চলেন। অর সাথে কথা কইতে হইব। কালাগিরি ঘুচাচ্ছি অর।...না-না, খাইয়া নেন। অত তাড়া নাই।

রবার্ট গাড়িতেই সিট এলিয়ে ঘুমোচ্ছিল।

—রবার্ট! হাই রবার্ট।

চোখ কচলে উঠে বসল রবার্ট,—ইয়া, ইয়া! লেত্স গো।

ওয়ান সেক্!—তুখোড় অ্যাম্যারিকান অ্যাকসেন্টে মিন্টু ওর কানের কাছে জোরে-জোরে বললেন, ডু য়ু হ্যাভ কার ওনারস সেল নাম্বার?

—আই'ম ওনার।

—ও. কে.। দেন হু অ্যাপয়েন্টেড য়ু?

—ডেভিদ।

—গিভ হিস নাম্বার। কুইক।

রবার্টের চোখ বড়-বড়। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে আস্তে-আস্তে এগিয়ে দিল।

ডেভিড কোলম্যান। নিউ ইয়র্কের ঠিকানা। নীচে ফোন নাম্বার।

সেল বার করে মিন্টু বোতাম টিপলেন। তারপর ইংরেজিতে যা কথা হল, তা এইরকম—

—হ্যালো। ডেভিড? আমি মিন্টু, হাউফোর্ড থেকে বলছি। আমার বন্ধুরা তোমার পাঠানো গাড়িতে চেপেছে। প্রফেসর মুখার্জি। বাই চান্স আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। ড্রাইভার রবার্ট কানে শোনে না, কিছুই জানে না। কে তোমায় কাজটা দিয়েছে?...ওয়াট? জন কেরি?...ঊরস্টারে থাকে? জনের নাম্বার দাও।...না। এরা জনকে চিনতে পারছে না। ও কে।

এবার দ্বিতীয় নাম্বার টিপলেন।

—হ্যালো, জন? আমি মিন্টু। আমার সার প্রফেসর মুখার্জি তোমার ঠিক করা গাড়িতে উরস্টারে যাচ্ছেন। চিনতে পারছ? বাট দে ক্যান্‌ট।...ও.কে. ও.কে.।...তুমি কীভাবে যুক্ত প্রফেসর দেবের সঙ্গে? ওকে।...তুমি এখন কোথায়? এরা কি দেবের বাড়িতেই যাবে?... রাইট।...তুমি কি বাই এনি চান্স, পিনাকীকে চেনো? দেবের নেফিউ? ওর ফোন নাম্বার আছে?...প্লিজ।...থ্যাঙ্কিউ জন। থ্যাঙ্কিউ।

এবার তৃতীয় নাম্বার।

দু-তিনবার বোতাম টিপে, রিডায়াল করে কানে ধরে রাখলেন। তারপর মাথা নাড়লেন, নাহ্! ধরত্যাছে না। বাইজা-বাইজা ভয়েস মেলে চইল্যা যাইত্যাছে। রেকর্ড করায়ে লাভ নাই। আমারে চিনতে পারবে না।...হুঁ!

ফোন নামিয়ে রেখে মিন্টু বললেন, শোনলেন তো সার! কাল সন্ধ্যায় আপনার বন্ধু প্রফেসর দেব তাঁর কলিগ প্রফেসর জন কেরিরে ফোন কইরা কন, সকালে নিউ ইয়র্কের এয়ারপোর্ট থেকে আপনারে রিসিভ কইরা ওনার বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে। জন তার নিউ ইয়র্কের বন্ধু ডেভিডরে রেসপন্সিবিলিটিটা দিয়া দেয়। ডেভিড তখন রবার্টরে ফিট করে।

—কিন্তু পিনাকী? সে কোথায়?

—সেটাই তো ভাবতাছি। ফোনও ধরে না।...সার, আপনাগো কাছে সেল ফোন আছে?

—আছে। ইন্ডিয়ার নাম্বার। রোমিং।

—বাপ্‌রে। সে যে অনেক চার্জ।

চার্জ তো পরের কথা!—আমি বললাম, এখন বিপদটা হচ্ছে ফোনের ব্যাটারি পুরো ডাউন। এখনই চার্জ দিতে হবে। চার্জার আছে। কিন্তু কোথায় যে দেব, খুঁজে পাচ্ছি না।

বার করেন। ভিতরে প্লাগ পয়েন্ট আছে।—সাইড ব্যাগ থেকে চার্জার বার করতেই মিন্টু কপালে করাঘাত করলেন, হায় কপাল! এ চার্জার এদেশে চলব না। এখানে খাড়া পিন।

—চার্জার কিনতে পাওয়া যাবে না?

—এইসব জাগায় পাবেন না। নিউ ইয়র্ক বা বস্টনে পাইলেও পাইতে পারেন। এই কোম্পানি এদেশে তেমন চলে না।

—তাহলে?

—দাঁড়ান।

বলেই ছুটে গেলেন একটু দূরের ছোট দোকানে। খানদশেক দু-ডলারের ফোনকার্ড এনে গুঁজে দিলেন আমার হাতে।

জগুমামা উদাসভাবে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন।

—কী ভাবছেন সার?

—না, ভাবছি এগোব, না ফিরে যাব?

—ফিরে যাবেন? কন কি সার? হাভার্ডে আপনের পরশু লেকচার, এতবড় সম্মান!

মিন্টু একমুহূর্ত ভাবলেন। তারপর হঠাৎ পলাশের দিকে ফিরে বললেন, পলাশ! তরে একটা কথা কমু? মনে কিছু করবি না ত?

—আরে! বল না।

—স্যারেদের বিষয়ডা আমারও কেমন-কেমন লাগতাছে। মনে হয়, সঙ্গে যাওন লাগে। ধর, অরা গিয়া দ্যাখলেন প্রফেসর দেব বাড়ি নাই। দরজা বন্ধ। তখন কী করবেন ক' দেখি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কুন ব্যাপার না। চল।

—না, না, এটা কী বলছ তোমরা? আজ ছুটির সকাল। আনন্দ করতে বেরিয়েছ।

—সে সার কাল হবে। নয়তো পরশু। পলাশ একসপ্তা আছে। আর বেশিক্ষণের তো কাম নয়। আপনাগো পৌঁছাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া চইলা আসুম। ওদিক থিকা প্লাইমাথের রোড আছে। চলেন, দেরি করি না।...হ্যাঁ ভাই টুকলু, তোমার নাম্বারডা আমারে দাও। আর এইসব নাম্বারগুলান নোট কইরা লও। আপনাগো গাড়ি আগে যাবে, পিছনে আমরা।

ব্যাপার দেখে রবার্ট বেশ চুপসে গেছে। সে মিন্টুর বোলচাল দেখে ধরে নিয়েছে, এরা পুলিশের লোক।

গাড়ি চালাতে-চালাতে মাঝে-মাঝেই বলছে, এভরিথিং ওকে সার?...

এনি প্রবলেম সার? আই'ল দ্রপ য়ু সার, ও কে?

মামা কোনও উত্তর দেননি। হেসেছেন।

মিন্টুর দূরদর্শিতার প্রশংসা করতে হয়। ঝকঝকে নীল আকাশ। দুপাশে ছবির মতো বাংলো। পাইনবনের মধ্যে দিয়ে রবার্টের গাড়ি এসে থামল। প্রাণতোষ দেবের স্রুসবেরির বাগান-বাংলোর সামনে। দোতলা বাড়ি। জানলা-দরজা সব বন্ধ।

এই ফাঁকে একটা অদ্ভুত যন্ত্রের কথা বলে নিই। জি. পি. আর. এস। এদেশে প্রায় সব গাড়িতেই এই যন্ত্রটি ফিট করা থাকে। যেখান থেকেই রওনা হওয়া যাক, যাত্রা শুরুর আগে যন্ত্রে গন্তব্যস্থলের ঠিকানা লিখে দিলেই হল। ওই যন্ত্রটা যান্ত্রিক ভয়েসে বলে যাবে নিখুঁত ডিরেকশন। পথ হারানোর কোনও চান্স নেই। এ যে কী সুবিধে, বলে বোঝানো যাবে না।

পাঁচিলের গেটেই কলিংবেল। মিন্টু বেশ কয়েকবার বাজালেন। কোনও সাড়া নেই।

মিন্টু এবার রীতিমতো চেঁচাতে শুরু করলেন, প্রফেসর দেব! প্রাণতোষ সার!

কাজ হল। পাশের একটি বাংলোর গেট খুলে গেল। এক শ্বেতাঙ্গ প্রৌঢ়া বেরিয়ে এলেন রাস্তায়।

—তোমরা কি পিটি দেবকে খুঁজছ?

—হ্যাঁ।

—তোমরা কোথা থেকে আসছ?

—ইন্ডিয়া।

—তোমাদের মধ্যে কেউ কি মুখার্জি আছে?

—হ্যাঁ। আমি জেবি মুখার্জি। ওর বন্ধু।

—ওকে। ওর কোনও আত্মীয়কে চেনো?

—একজনকে। পিনাকী।

—রাইট। আমার নাম মার্গারেট। দেব আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিছু মনে কোরো না, তোমাদের এতক্ষণ ইন্টারোগেট করলাম বলে। কোনও আননোন পার্সনকে তো ঢুকতে দিতে পারি না ওর বাড়িতে।

ও বিশ্বাস করে একসেট চাবি আমার কাছে রেখে যায়। ফর এমার্জেন্সি।

বলে গাউনের পকেট থেকে একতাড়া চাবি বের করে তুলে দিলেন জগুমামার হাতে।

—থ্যাঙ্কিয়ু ম্যাম। একটা কথা, প্রফেসর দেব কোথায় গেছে জানেন?

—না। সকাল থেকে ওকে দেখতে পাচ্ছি না। অথচ কাল ইভনিং-এ বলছিল, তোমরা আসবে।...যাও, ভেতরে যাও। হয়তো কোনও এমার্জেন্সি কাজে বেরিয়েছে। এসে পড়বে।

চলেন সার।—রবার্টের গাড়ি থেকে লাগেজ নামাতে-নামাতে মিন্টু বলল, ভিতরে গিয়া দেখি। চিন্তা করবেন না সার, আমরা আছি।

রবার্ট হু-স্ করে গাড়ি চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।...

বাংলোর একদিকে গ্যারাজ। পাশ দিয়ে ঢোকার দরজা।

মিন্টু অভিজ্ঞ হাতে দু-তিনটে চাবি ট্রাই করতে-করতে লেগে গেল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম পাঁচজন। ভিতরটা আবছা অন্ধকার। ভেনিসিয়ান ব্লাইন্ড (এক ধরনের পলিয়েস্টার পর্দা) টানা।

একতলায় বড় একটা বেডরুম। পাশেরটা ড্রইংরুম, টয়লেট। সব টিপটপ।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে প্রথমে ড্রইং-কাম-ডাইনিং হল এবং ওপন কিচেন। রুম ফ্রেশনারের মিষ্টি গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। ড্রইংরুমে বিশাল-বিশাল ডিভান, সোফাসেট। সেন্টার টেবিলে ল্যাপটপ চালু। সবুজ আলো জ্বলছে। দেওয়ালজোড়া এলসিডি স্ক্রিন টিভি, ডিভিডি। দেওয়ালে ফিকস্‌ড সাউন্ড বক্স। টিভির নীচে লাল বিন্দু। মেইন সুইচ চালু আছে।

কিচেন তকতকে। কুকিং রেঞ্জ, বার্নার, ফ্রিজ, ফিল্টার, ওটিজি, মাইক্রোওয়েভ। ডাইনিং টেবিলে একটা প্লেট, কাঁটা চামচ, পাউরুটির টুকরো।

হঠাৎ মাথাটা একটু টলে গেল! এতক্ষণে বোধহয় জেট ল্যাগ জানান দিচ্ছে। ঝিমুনিও আসছে।

ডানদিকে ঘুরলেই তিনটে বড়-ছোট বেডরুম। বড়টির বিছানা একটু এলোমেলো। দুপায়ের দুটো স্লিপার একটু দূরত্বে পড়ে আছে। অন্যটিতে সিঙ্গল বেড টানটান। কার্পেটের ওপর মোটা গদি পাতা। ছোট একটা টিভি, কম্পিউটার।

—প্রাণতোষবাবু কি এতবড় বাড়িতে একাই থাকেন?

—তা ছাড়া উপায় কি? ব্যাচেলার লোক। দোকা পাবে কোথায়?

—মিন্টু, আমি একটু বসি। ঘুম-ঘুম পাইতাছে।

পলাশ সোফায় বসে পড়লেন।

অনন্তবাবু গিয়ে পাশের সোফাটায় দড়াম করে এলিয়ে পড়লেন, হা—ওঃ! কী ঘুম পাচ্ছে রে বাবা।

আমার মাথাটা আরেকবার টাল খেল। দেওয়ালে ধরে সামলে নিলাম।

জগুমামা দাঁড়িয়ে পড়েছেন, মিন্টু! মিন্টু!

মিন্টু টয়লেটে গেছিলেন। ছুটে এলেন, সার!

—কিছু বুঝতে পারছ?

—না তো সার। শুধু একটু ঝিমঝিম...

—এখনই জানালাগুলো খুলে সব কার্টেন সরিয়ে দাও। এসিগুলো চালিয়ে দাও। ক্যুইক! ভিতরে ঘুমপাড়ানি গ্যাস স্প্রে করা হয়েছে।

—গ্যাস!

—হ্যাঁ। যে গন্ধকে রুম ফ্রেশনার ভাবছিলাম, সেটা আসলে হ্যালোথেনের গন্ধ। অপারেশনের সময় আনকন্‌সাস করতে ইউজ হয়।

—মাই গড!

৪

—মিন্টু, তোমার কফি রেডি?

—জি সার।...টুকলুদা, আপনি কাপগুলান বার করেন।

—চিনি, দুধ দাও নি তো?

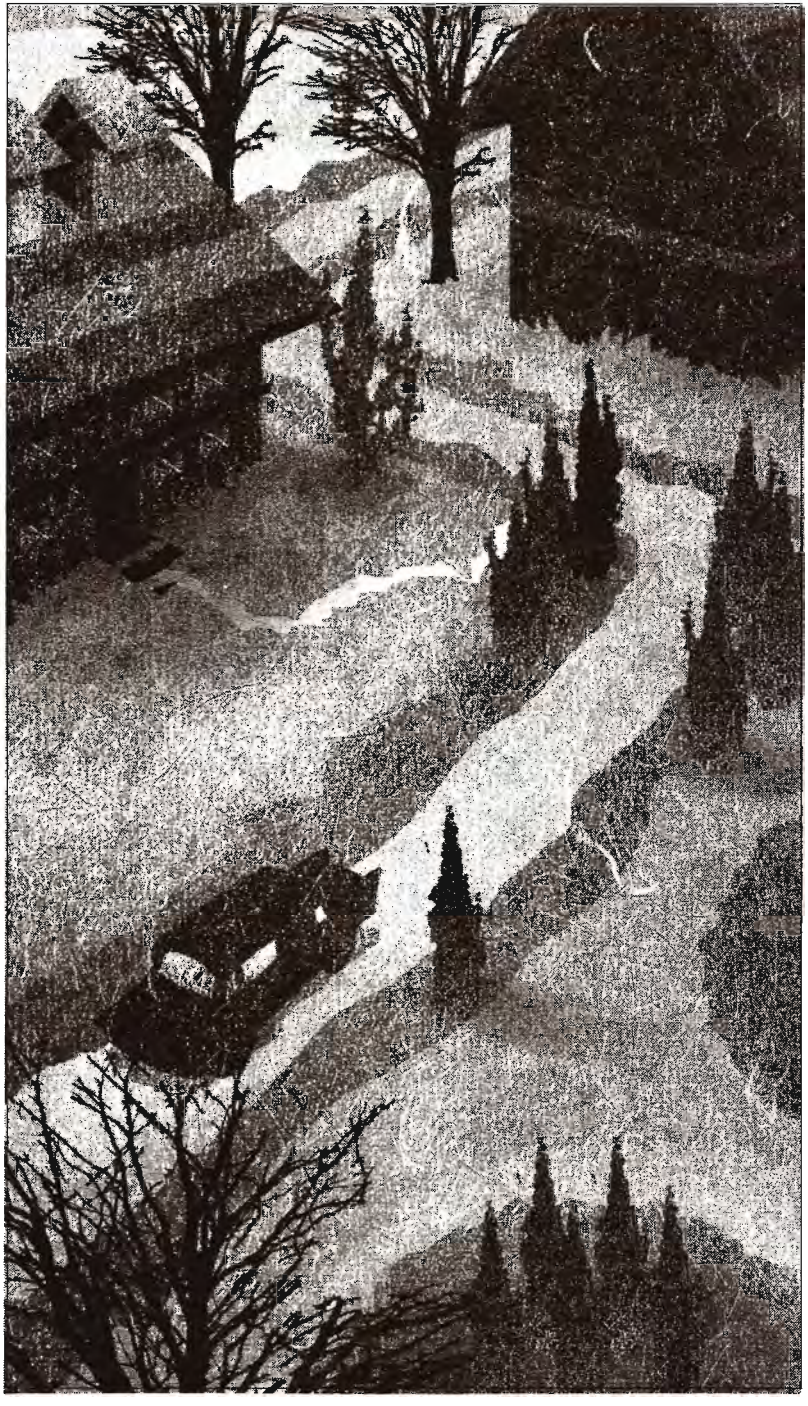

—না সার। ওনলি কফি।

—গুড। আগে পলাশ আর অনন্তবাবুকে খাইয়ে দাও।

জগুমামা দরজা খুলে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। ঘরের মধ্যে হাইস্পিড ফ্যান মোডে এসি মেশিনগুলো চলছে। এখনও একটা হালকা গন্ধের রেশ রয়েছে।

ফার্নিশড কিচেন। লফ্‌টে রান্নার যাবতীয় উপকরণ সাজানো। টি-ব্যাগ, কলাম্বিয়ান কফির জার পাশাপাশি। খুঁজে পেতে একটুও অসুবিধে হয়নি।

এরমধ্যে মিন্টুর ফোন থেকে জগুমামা সঞ্জয়মেসোকে ফোন করেছেন। সঞ্জয়মেসো, টিনামাসি দুজনেই য়ুম্যাসের (য়ুনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস) মেইন ক্যাম্পাসে চাকরি করেন। শুনলাম, এখান থেকে মিনিটপঁচিশের পথ। যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়বেন।

পলাশ আর অনন্তবাবুকে প্রায় ঘেঁটি ধরে সোজা করানো হল। ঈষদুষ্ণ কফির কাপ ধরে বাচ্চাদের মতো পান করানো হল। দু-চুমুক দেওয়ার পর দুজনেই সোজা হয়ে বসতে পেরেছেন। হাতে কফির কাপ ধরে বড়-বড় চোখে তাকিয়ে আছেন। বোঝা যাচ্ছে, ঘোর এখনও কাটেনি।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে জগুমামা বললেন, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না! এলাম বক্তৃতা দিতে আর বেড়াতে, সব ওলটপালট হয়ে গেল।

—ত্র্য-হ্-স্প-র্শ!

অনন্তবাবু জড়িয়ে-জড়িয়ে বললেন।

—ত্র্যহস্পর্শ?

—হ্যাঁ, মিন্টুবাবু। স্যারের সঙ্গে টুকলু আর আমি থাকলেই...জানেন এইসব হ্-য়। ওউঃ, এখনও কী ঘুম পাচ্ছে।

—তাড়াতাড়ি কফিটা খান। গরম থাকতে-থাকতে। ঠিকই বলেছেন। তাই ঠিক করেছি, এর পরে তিনজনে আর কোথাও বেড়াতে যাব না!

—এ-এইরে...না-না স্যার। প্লিজ স্যার। ঘুমের ঘোরে কী বলতে কি...

—সত্যি কথাটা বেরিয়ে গেছে। যাকগে, ভবিষ্যতের কথা পরে। ...একটু ভেবে দেখা যাক, প্রাণতোষের কী-কী হতে পারে? মার্ডার? কিডন্যাপ? কিন্তু কেন? নাকি নিজেই জরুরি কারণে কোথাও গেল? সেক্ষেত্রে অবশ্য নিশ্চয়ই স্লিপ লিখে যেত। ওর বাড়িতে হ্যালোথেন গ্যাসই বা ছড়িয়ে পড়ল কেন? কেউ স্প্রে করল আমাদের ঘুম পাড়াতে? সেটাই বা কেন? আমাদের ঘুম পাড়িয়ে কার কী লাভ?

—সার, এডাও ত হইতে পারে, প্রফেসর দেব বাড়িতে ওই গ্যাস আইনা রাখছিলেন। রিসার্চের কাজে। কোনওভাবে সিলিন্ডার লিক্ কইরা গেছে গিয়া।

হুঁ।—জগুমামা বললেন।

—মামা, ওই গ্যাস লিক করেই হয়তো প্রাণতোষ দেব আনকনশাস হয়ে পড়েছেন। হসপিটালে ভর্তি করতে হয়েছে।

—কিন্তু পিনাকী? সে ফোন ধরছে না কেন?

—তাকে হসপিটাল অথরিটি নিশ্চয়ই খবর দিয়েছেন। এদেশে ওনলি রিলেটিভ। সে কাকার কাছে আছে। যেহেতু হসপিটাল, তাই সেলফোন সাইলেন্ট মোডে রেখেছে। তার ওপর অচেনা নাম্বার। ধরছে না।

জগুমামা হেসে ফেললেন। বললেন, ভেরি গুড। বেশ যুক্তি সাজিয়ে ফেলেছিস।...এটা হতে পারে। তবে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর, আমরা যে আসছি বা এসে পড়েছি, এ খবর পিনাকী নিশ্চয়ই জেনে গেছে।

—জেনে গেছে?

—হ্যাঁ। জন কেরি, যে আমাদের এখানে আসার গাড়ি অ্যারেঞ্জ করেছে, সে তো প্রাণতোষের রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট। য়ুম্যাসে, একই ল্যাবরেটরিতে দুজনে কাজ করে। মিন্টুর সঙ্গে কথা বলার পর সে নিশ্চয়ই পিনাকীকে জানাবে। পিনাকী তার ফোন নিশ্চয়ই ধরবে।

—যদি তাই হয় মামা, তাহলে জনের প্রাণতোষবাবুর খবর জানার কথা। সে তো ফোনে মিন্টুভাইকে কিছু বলল না। চেপে গেল কেন?

—টুকলুদা, হইতে পারে তখনও পর্যন্ত জন জানত না। আমাদের

সাথে কথা হওয়ার পর জানতে পারছে। আমরা টেনশন করব ভাইবা পরে আর জানায় নাই।

একটা গাড়ির শব্দ। সঞ্জয়মেসোরা এসে গেল? দ্রুত উঠে ব্যালকনিতে গেলাম। বাউন্ডারির গা ঘেঁষে পাইনগাছের ফাঁকে সিলভার কালারের বড় গাড়ি। সব কাচ তোলা। আরোহীদের দেখা যাচ্ছে না।

গাড়িটা দশ সেকেন্ড দাঁড়াল, তারপর চলে গেল এঞ্জিনের শব্দ করে।

—কে এল রে টুকলু?

—কেউ না। দাঁড়াল, চলে গেল। অদ্ভুত!

জগুমামা একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। আস্তে-আস্তে বললেন, ব্যাপারটা কি এতটা সরল?...মিন্টু, তুমি আবার জনকে ধরো তো।

মিন্টু ফোন নাম্বারটা খুঁজতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই আবার গাড়ির শব্দ। পরক্ষণে গাড়ির দরজা খোলার শব্দ এবং বিশুদ্ধ অ্যাম্যারিকান অ্যাকসেন্টে বাজখাঁই ডাক, হ্যালো—হ্যালো! হাই!

আমরা ব্যালকনিতে বেরিয়ে দেখি, তিনজন সবুজ উর্দিপরা কালো ও সাদা সায়েব। একজনের হাতে লাইট স্টেনগান জাতের অস্ত্র।

শ্বেতাঙ্গ অফিসার ফের চেঁচিয়ে বললেন, হাই গাইস্! হু 'র য়ু?

জগুমামাও চেঁচিয়ে বললেন, উই'র গেস্টস।...প্লিজ কাম!...টুকলু, দরজাটা খুলে দে।

ঠক্‌ঠক্ ভারী বুটের শব্দ তুলে তিনজন পুলিশ সন্দিগ্ধচোখে তাকাতে-তাকাতে আমার সঙ্গে ওপরে উঠে এলেন।

হ্যান্ডশেক হল এবং তারপর মামা বললেন, উই'র ওয়েটিং ফর য়ু।

—রিয়্যালি?

—ইয়া। উই'ভ অ্যারাইভড্। বাট আ'র হোস্ট, ওনার অব দিস হাউস ইস মিসিং।

—ওয়াট?

মামা এরপর খুব সংক্ষেপে ঘটনাগুলো বললেন।

অফিসার কয়েকমুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তারপর

বললেন, সারপ্রাইজিং! অথচ জান, আমাদের হেড কোয়ার্টারে খবর গেছে, এই বাড়িতে কিছু 'আননোন ট্রেসপাসার' ঢুকেছে।

—কে খবর দিল?

—নাম ডিসক্লোজ করেনি। প্রব্যাবলি, আশেপাশের প্রতিবেশী কেউ। আসলে এ দেশে তো কেউ জানলা-দরজা সচরাচর খোলে না। এ বাড়ি খোলা দেখেই টোল ফ্রি নাম্বারে পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছে।

জগুমামা এবার বললেন দরজা-জানলা খোলার কারণ।

অফিসারের ভ্রু ও চোখ কুঁচকে গেছে। কিছু বলার আগেই ওর দুজন সহকারী তন্নতন্ন করে বাড়ির ওপরে-নীচে খুঁজতে শুরু করলেন।

অফিসারের নাম ড্যানিয়েল। ড্যানিয়েল জেফারসন। মিন্টু জগুমামার পরিচয় দিয়েছেন। কেন এসেছেন এদেশে, সেটাও বলেছেন। স্বভাবতই, ড্যানিয়েলের কথাবার্তার সুর এখন একটু পালটে গেছে।

মিনিটতিনেকের মধ্যেই ড্যানিয়েলের দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট বিজয়ীর মতো ড্রইংরুমে ঢুকলেন। একজনের হাতে লাল রঙের একটি মাঝারি সাইজের সিলিন্ডার। স্প্রেয়ারের মুখে বাঁকানো লম্বা নল লাগানো। সিলিন্ডারের গায়ে কালোরঙে বড়-বড় হরফে লেখা 'হ্যালোথেন'।

এই তো!—মিন্টু বলে উঠলেন।

ব্ল্যাক অ্যাসিস্ট্যান্ট সিলিন্ডার ঝাঁকিয়ে বললেন, এখনও কিছুটা ভিতরে আছে। শোওয়ার ঘরে টিভির পাশে ছিল।

তার মানে গ্যাস লিক করেনি!—জগুমামা বললেন, করলে এখনও গন্ধ পাওয়া যেত। যাচ্ছে না। অর্থাৎ স্প্রে করা হয়েছে। মনে হচ্ছে, এই গ্যাস স্প্রে করেই প্রাণতোষকে অজ্ঞান করা হয়েছে। তারপর কিডন্যাপ করা হয়েছে।

রিয়্যালি?—ড্যানিয়েল বললেন, তাহলে আমাদের এখনই ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট করা উচিত।

—জগুদা! টুকলু! জগবন্ধু মুখার্জি!

আমরা এত মগ্ন ছিলাম যে, গাড়ির শব্দ শুনতে পাইনি। সঞ্জয়মেসো আর টিনামাসি এসে পড়েছে।

কিন্তু তারপরেও আমাদের জন্যে বড় চমক অপেক্ষা করছিল।

সঞ্জয়মেসো উদ্বিগ্ন মুখে ধপ্‌ধপ্‌ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে বলে যাচ্ছিলেন, কী ব্যাপার জগুদা! কী হল? পুলিশের গাড়ি কেন? ডক্টর দেবের খবর কিছু এল?

তারপরেই থেমে গেলেন। ড্যানিয়েলের দিকে কয়েকমুহূর্ত চেয়ে থেকে সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, আরে, ড্যানিয়েল! তুমি! কতকাল পরে!

ড্যানিয়েলও উঠে দাঁড়িয়েছেন। প্রায় ছুটে এসে সঞ্জয়মেসোকে জড়িয়ে ধরলেন, হাই স্যানজি! ওয়াট আ সারপ্রাইজ। আফটার সো মেনি ইয়ারস!

জানা গেল, ড্যানিয়েল এবং সঞ্জয় বহু পুরোনো বন্ধু। সঞ্জয় বাংলাদেশ থেকে স্কলারশিপ নিয়ে যখন নিউইয়র্কে মাস্টার্স করতে এসেছিলেন, ড্যানিয়েল ছিলেন ওর ক্লাসমেট। গাঢ় বন্ধুত্ব হয়েছিল দুজনের মধ্যে। মাস্টার্সের পর দুজনে একসঙ্গে কম্পিউটার এঞ্জিনিয়ারিং-এ স্পেশালাইজেশনও করেন। সঞ্জয় এরপরে চাকরি নিয়ে চলে যান টরন্টোয়। ড্যানিয়েল যান ক্যালিফোর্নিয়ায়। সেই থেকে যোগাযোগ নেই। পনেরো বছর পরে দেখা।

দুই বন্ধুত্বে নিজেদের কথা নিয়েই জমে গেছেন। টিনামাসি পড়েছে আমায় নিয়ে। বাড়ির খবর, মা-মাসি, দিদাদের খবর, ছেলেমেয়েরা কে কী করছে...এইসব। মাসিও এগারো বছর দেশে যায়নি।

জগুমামা উসখুস করছেন। ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। প্রায় তিনটে বাজে।

তারপর বলেই ফেললেন, সরি টু ইন্টারাপ্ট য়ু। কিন্তু সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। ড্যানিয়েল, আমাদের ইনভেস্টিগেশন, প্রাণতোষকে খোঁজার কাজটা বোধহয় শুরু করা দরকার।

—ও সিওর! সরি স্যর!

বলেই পকেট থেকে সেলফোন বার করলেন।

—হ্যালো। ড্যানিয়েল স্পিকিং।...প্রফেসর প্রাণটোষ দেব স্টেয়িং অ্যাট ফোর নিউটন রোড, শ্রুসবেরি ইস মিসিং ফ্রম হিস রেডিডেন্স।...

ইয়া।... প্রবাবলি ফ্রম দিস মর্নিং।...ইয়া।...প্লিজ ইনফর্ম মি...।

ফোন কেটে দিয়ে আমাদের বললেন, হেড কোয়ার্টারে মিসিং ইনফর্মেশন রেকর্ড করালাম। উইদিন ফাইভ মিনিটস ওরা জানিয়ে দেবে, যদি কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয় বা কোনও হসপিটালে অ্যাডমিটেড উনি হয়েছেন কিনা। যদি খবর না থাকে, তারপর আমরা কাজ শুরু করব। আমাদের এদেশে প্রত্যেক বাড়ির প্রত্যেক সিটিজেনের যাবতীয় ডেটা এন্ট্রি থাকে সেন্ট্রাল কম্পুটারে। ধরুন, আপনি কোনও ট্রিটমেন্ট করাতে অন্য কোনও দূরের শহরের হসপিটালে ভরতি হলেন, সেই ইনফর্মেশনও তখনই পুলিশের কাছে চলে আসবে!

সত্যিই পাঁচমিনিটও লাগল না।

তিনমিনিটের মধ্যেই ড্যানিয়েলের সেলফোন বেজে উঠল। এবং ওর মুখচোখ পালটে গেল।

—হ্যালো!...ওয়াট?...ওয়েন?...কানডিশন?...ওহ্ মাই গড্।...ও কে। ও কে।...আই'ল কল য়ু।...সিওর।...

ড্যানিয়েল কয়েক সেকেন্ড থম মেরে থাকলেন। তারপর কেটে-কেটে বললেন, ভেরি ব্যাড নিউজ। প্রফেসর দেব কাল রাত তিনটেয় সেন্ট ভিনসেন্ট হসপিটালে অ্যাডমিটেড হয়েছেন। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। কনডিশন বেশ খারাপ। স্ট্রিক্টলি আন্ডার অবজারভেশনে রাখা হয়েছে। টোটালি আনকনশাস।

—হার্ট অ্যাটাক? হাউ'জ ইট পসিব্‌ল? ওর হার্টে কোনও গোলমালের কথা কখনও শুনিনি। পরশু সন্ধেয়, মানে এখানকার সময় সকালে ওর সঙ্গে কথা হল। হি ওয়জ একসাইটেড। ওর অ্যাসোসিয়েট জন কেরি আজ সকালেও জানাল, প্রাণতোষ ওকে কাল সন্ধেয় গাড়ির ব্যবস্থা করতে বলেছে।..কী বলছে ডাক্তাররা?

—বলছে, চব্বিশ ঘণ্টা না কাটলে কিছুই বলা যাবে না। তবে বেস্ট পসিব্‌ল ট্রিটমেন্ট চলছে।

—ড্যানিয়েল! আমরা এখনই হসপিটালে যেতে চাই।

—ও কে। চলুন।

সঞ্জয়মেসো বিড়বিড় করলেন, আমাদের য়ুম্যাসের মেডিক্যাল

ইউনিট সবচেয়ে ওয়েল ইকুইপিড। ডক্টর দেব য়ুম্যাসের গ্রেড ওয়ান সায়েন্টিস্ট। সেন্ট ভিনসেন্টে ভরতি করল কেন?

৫

এদেশে গ্রীষ্মকালে অন্ধকার নামে সাড়ে-আটটা-ন'টায়। এখনও ঝলমলে রোদ। মেঘহীন চকচকে নীল আকাশ, চোখজুড়োনো সবুজ প্রকৃতি আর ছবির মতো পরপর বাড়ি পথের দুপাশে।

সঞ্জয়মেসোর গাড়িতে আমাদের লাগেজ তুলে দেওয়া হয়েছে। রাতে ওদের বাড়িতেই থাকব। ড্যানিয়েলের এক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রাণতোষ দেবের বাড়িতে অপেক্ষা করছেন। লোক্যাল পোলিস স্টেশন থেকে স্পেশাল লক নিয়ে এসে বাড়ি লক করে দিয়ে যাবেন। প্রতিবেশিনী মার্গারেটকে এ কথা জানিয়ে এসেছি।

হাইওয়েতে ওঠার পর ডানদিকে বিশাল ইন্ডিয়ান লেক। টলটলে সুনীল জল। এত বড় যে স্পিডবোটগুলোকে পিঁপড়ের মতো লাগছে। টিনামাসি বলল, এই লেক থেকেই উরস্টার, স্রুসবেরি, গ্র্যাফটন শহরের জল সরবরাহ করা হয়। ট্রিটমেন্ট করার পরে। চারিদিকে ছোট-বড় সবুজ পাহাড়।

আমরা এলাম সেন্ট ভিনসেন্ট হসপিটালে।

হাসপাতাল, না ফাইভ-স্টার হোটেল? সাধে কি আর আমাদের দেশের মানুষ নিঃসঙ্গতা ভোগ করেও এদেশে পড়ে থাকে!

সুপারের ঘরখানা দেখবার মতো। কী নেই? বর্ষীয়ান ডাক্তার। ওঁর কাছ থেকে জানা গেল, কাল রাত তিনটে পনেরো মিনিটে প্রফেসর দেবকে মোবাইল রেসকিউ ভ্যান এনে ভর্তি করিয়েছে। তখন উনি টোটালি আনকনশাস। প্রচণ্ড ঘাম হচ্ছিল। ঘামে স্লিপিংসুট ভিজে গেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে ওকে এমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়। তারপর আই সি সি য়ু (ইনটেনসিভ কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট)-তে রাখা হয়।

ইনট্রাভেনাস মেডিসিন, কার্ডিয়াক মনিটরিং চলছে। এখনও কন্ডিশন যথেষ্ট ক্রিটিক্যাল। একটাই আশার কথা, উনি ট্রিটমেন্টে রেসপন্ড করছেন।

কৌতূহল হচ্ছিল। মামার প্রশ্ন আমার মনের কথাই বলল, ডোন্ট মাইন্ড। একটা কৌতূহল হচ্ছে। মোবাইল সার্ভিসে ইনফর্মেশন পৌঁছোল কী করে? যে কন্ডিশনে উনি অ্যাডমিটেড হয়েছেন, ফোন করার অবস্থায় ছিলেন না। আর প্রতিবেশী কেউ এখনও এই খবরটা জানে না।

সুপার বললেন, আমাদের এখানে এরকম সিঙ্গল পার্সনদের এমার্জেন্সি সিচুয়েশনের জন্যে একটা বিশেষ নেটওয়ার্কিং আছে। যারা একা একটা বাড়িতে থাকেন, তারা প্রায় সকলেই এই নেটওয়ার্কের গ্রাহক। তাদের কাছে সাধারণ ফোন ছাড়াও 'এস ও এস' ফোন থাকে। সেই ফোনে একটাই বোতাম। বোতামে চাপ দিলেই একসেকেন্ডে সার্ভিসে খবর পৌঁছে যায়। সবচেয়ে কাছের রেসকিউ ভ্যান কয়েক মিনিটের মধ্যে ছুটে আসে। ওই রেসকিউ ভ্যানে সিকিওরিটি, ফায়ার ফাইটিং থেকে শুরু করে সমস্ত মেডিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে। রেসকিউ পার্সোনেলরা যেকোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে।

—কিন্তু বাড়ি নিশ্চয়ই ভিতর থেকে লক ছিল?

—থাকলেই বা। ওটা কোনও ব্যাপার নয়। ওদের কাছে মাস্টার 'কি' থাকে। তা দিয়ে যেকোনও লক খোলা যায়।

—এখন একবার প্রফেসর দেবকে দেখা যাবে?

সুপার একটু ইতস্তত করে বললেন, মানে...এরকম পেশেন্টকে... ওর...একজন...

কথা শেষ হল না। চেম্বারের দরজা খুলে একজন যুবক ঢুকে পড়ল। চুল উসকোখুসকো, চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ।

—হাই! আমি পিনাকী। আপনারা কি ইন্ডিয়া—

—হ্যাঁ। আমি তোমার কাকার বন্ধু। জেবি মুখার্জি। তোমার কাকার বাড়িতে উঠেছিলাম। ওখান থেকে খবর পেয়ে আসছি।

—সরি আঙ্কল। আমার ফোনে সকাল থেকে কয়েকটা মিস্‌ড কল

হয়েছে। বোধহয় আপনারাই কেউ করছিলেন। কিন্তু আমি হসপিটালে ব্যস্ত থাকায় ধরতে পারিনি। সাইলেন্ট মোডে ছিল। মেন্টালি এত আপসেট ছিলাম, কলব্যাক করিনি। করা উচিত ছিল। তবে জন আমায় যখন ফোন করেছিল, ওকে বলেছিলাম, আপনাদের জানিয়ে দিতে।

—তুমি কখন খবর পেয়েছ?

—আমায় এরা ফোন করেছিল আটটায়। আমি তখন জাস্ট ল্যাবরেটরিতে ঢুকে কাজে বসেছি। আমরা কাজ থাকলে রবিবারেও আসি। কাকা জেনারেলি ন'টায় ঢুকতেন। জন ছিল। খবর পেয়েই ছুটে এসেছি। সো শকিং! ক্যান্‌ট বিলিভ।

—এখন কন্ডিশন কেমন?

—ভালো না আঙ্কল। অবশ্য এদেশে ট্রিটমেন্ট আউটস্ট্যান্ডিং। দেখা যাক।

—চলো। বাইরে গিয়ে কথা বলি।...থ্যাঙ্কিয়ু ডক্টর।

হসপিটালের বাউন্ডারির বাইরে ছোট ছোট কফিশপ। সঞ্জয়মেসো কফির অর্ডার দিলেন।

মামা একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। নির্মল বাতাস একটু হলেও দূষিত হল। হালকা ঠান্ডা-ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

—তোমার সঙ্গে প্রাণতোষের কবে দেখা হয়েছিল?

—কাল রাতেই! কাকার বাড়িতে একসঙ্গে ডিনার করলাম। আপনাদের ফ্লাইট যে সকালে নামছে, খেয়াল ছিল না আমাদের। কাকা নিজে থেকেই বললেন, 'তুই কী করে পৌঁছোবি? তাহলে তোকে রাত দুটো-আড়াইটেয় এখান থেকে গাড়ি নিয়ে যেতে হয়।' তারপর জনকে ফোন করে বললেন। জন ওর নিউইয়র্কের বন্ধুকে ফোন করে গাড়ির ব্যবস্থা করল। সেটা আমাদের জানিয়েও দিল।

—হ্যাঁ। তোমায় এয়ারপোর্টে না দেখে খুব অবাক হয়েছি। এনিওয়ে, কাল ক'টা পর্যন্ত ছিলে প্রাণতোষের বাড়িতে?

—সাড়ে দশটা। কাকা এগারোটায় শুতে যান।

—কিছু মনে কোরো না, তুমি কাকার ওখানে থাকো না কেন?

—এদেশে এসে প্রথমে কয়েকমাস কাকার বাড়িতে ছিলাম। তারপর

বুঝতে পারছিলাম, কাকার একটু অসুবিধে হচ্ছে। এত বচ্ছর একা থাকার অভ্যেস, কিছু-কিছু হ্যাবিট গ্রো করে যায়। ধরুন কিচেন, টয়লেট শেয়ারিং...এইরকম আর কি। স্কলারশিপ চালু হয়ে যাওয়ার পরে আমি য়ুম্যাসে হস্টেল চেয়ে অ্যাপ্লাই করলাম। অ্যাকোমোডেশন হয়ে গেল। দেখলাম, কাকা বাধা দিলেন না। অবশ্য সপ্তাহে দু-তিনদিন কাকার বাড়িতে ডিনার আমার বাঁধা। অসম্ভব ভালোবাসেন আমাকে।

—খুব স্বাভাবিক। তুমি একমাত্র ভাইপো। তুমি ছাড়া ওর আর আছে কে! বাই দ্য ওয়ে, প্রাণতোষের ল্যাবে কি তুমি আর জন?

—না-না। কাকাকে ধরলে ছ'জনের টিম। কাকা একনম্বরে। নেকস্‌ট টু হিম, জন। রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট। তারপর দুজন সিনিয়ার রিসার্চ ফেলো। দুজনেই ইন্ডিয়ান। করণ দেশমুখ আর তারা গণেশন। আমি আর টেড কেনেডি জুনিয়ার রিসার্চ ফেলো র‍্যাঙ্কের।

—তোমাদের এখনকার রিসার্চের সাবজেক্টটা কী?

—বেশ কমপ্লিকেটেড। অনেক দিন ধরে চলছে। হানি বি মানে মৌমাছি আর গরুর জিন এঞ্জিনিয়ারিং। মৌমাছির জিন গরুর জিনে ইমপ্ল্যান্ট করলে দুধে সুইটনেস এবং ফুড ভ্যালু দুটোই অনেকটা বেড়ে যাবে। ডায়াবেটিক পেশেন্টদের দারুণ ডায়েট হতে পারে। এটাই কাকার থিয়োরি।

—বাঃ। ইন্টারেস্টিং।

—হ্যাঁ। জন হাভার্ড য়ুনিভার্সিটিতে ছিল। কাকা ওকে বছরখানেক হল, নিয়ে এসেছেন। কথা বলে খুব ভালো লেগেছিল। একজন রিসার্চ অ্যাসোসিয়েটের পোস্ট ভেকেন্ট ছিল। জন ইস আ নাইস পারসন। কোনও ইগো নেই। সবার বন্ধু।

জগুমামা ফুরিয়ে যাওয়া সিগারেটটা ফেলে দিলেন টুসকি মেরে। তারপর আচমকা বললেন, পিনাকী! কাকার হার্ট অ্যাটাক সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়? নরম্যাল?

—আমি কিছুই বলতে পারব না আঙ্কল। কাকা কাল রাত পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। আমায় গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিলেন কথা বলতে-বলতে।

—তোমার গাড়ি ছিল?

—ওটা কাকারই গাড়ি। দুটো গাড়ি ওনার। একটা আমি ইউস করতাম। উনিই দিয়েছিলেন।

—প্রাণতোষের লাইফ-স্টাইল?

—অ্যাবসোলিউটলি নরম্যাল। টাইম মেপে খেতেন। খুব কম খেতেন। কোনও নেশা ছিল না।

—অদ্ভুত। সেই লোকের হঠাৎ এরকম ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক! তোমার অবাক লাগছে না?

—আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না আঙ্কল। তবে কাকার মধ্যে একটা চোরা টেনসন ছিল।

—টেনসন? কেন?

—যে রিসার্চ প্রজেক্ট নিয়ে আমাদের টিম কাজ করছে, তার ভায়াবিলিটি নিয়ে অনেকের সন্দেহ ছিল। সায়েনটিস্টদের গভর্নিং বডি মিটিং-এ বলা হয়েছিল, 'অ্যাবসার্ড!' কাকা য়ুনিভার্সিটির সঙ্গে বেশ লড়াই করে প্রজেক্ট নিয়ে এসেছেন। য়ুম্যাস প্রচুর টাকা খরচ করে যাচ্ছে প্রায় সাত বছর ধরে। আমার এখানে আসার আগে থেকেই। যখন যা চাওয়া হয়েছে, দিয়েছে। প্রজেক্ট রিনিউ করেছে। কিন্তু ফাইন্যাল সাকসেস কিছুতেই আসছে না। সেই নিয়ে কাকা নিজের মনেই মাঝে মাঝে বলতেন, 'হবে তো?' একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল বোধহয়। এ ছাড়া কাকার মধ্যে আর কিছু দেখিনি।

—ঠিক আছে। তুমি থাকো। আমরা চলি। আমাদের সমস্যা দেখেছ? এই বন্ধুটি, অনন্তবাবু, কফি খেয়েও কেমন ঢুলছেন। যে-কোনও সময়ে টুল থেকে পড়ে যাবেন।...অনন্তবাবু! অনন্তবাবু!

—অ্যাঁ—হ্যাঁ স্যার! আমায় কিছু বললেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। ঘুম পাবে। কিন্তু এখন ঘুমোবেন না। বায়োলজিক্যাল ক্লক সেট করে নি। এখন ঘুমোলে সারা রাত জেগে থাকতে হবে।

ও কে স্যার।—অনন্তবাবু উঠে আড়মোড়া ভাঙলেন, চলুন।

পিনাকী বলল, আঙ্কল! কাকার বাড়িটা এখন লক্‌ড থাকবে?

—হ্যাঁ। পুলিশ করেছে। এই যে ড্যানিয়েল, এটা ওদের ডিসিশন। কেন বলো তো?

—না। আমার কিছু টুকটাক পেপার আছে ও বাড়িতে। অবশ্য তেমন জরুরি কিছু নয়।

সঞ্জয়মেসোদের বাড়ি খোদ ঊরস্টারে। আরও চমৎকার জায়গা। এরা বলে 'সেভেন হিল সিটি'। পাহাড়ের মাথায় সবুজ পাইন বনের ফাঁকে-ফাঁকে উঁচু-নীচু রাস্তায় দোতলা সব বাংলো। থ্রি শাওনি রোড।

মিন্টু আর পলাশ চলে গেছে হসপিটাল থেকে। সঞ্জয়মেসো ফোন নাম্বার রেখেছে। কাল সকালে ফোন করবে। ড্যানিয়েলও জংলাসবুজ গাড়ি নিয়ে ফিরে গেছেন। ওর ফোন নাম্বারও মেসোর কাছে। কোনও খবর এলে জানাবেন।

এখন বিকেল সাতটা বাজে। গোধূলিবেলা। কম্পাউন্ডের লনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখছি। কী নিসর্গ! এই বাড়িটা একেবারে হিল টপে। বহু নীচে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সবুজ বনের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ।

সূর্যের মধুর আলো গাছেদের মাথায় আবির ঢেলেছে। আকাশেও কমলা রঙের খেলা। কোনও কোলাহল নেই। নিস্তব্ধ, নিথর। হাওয়ায় পাতা নড়ার শনশন শব্দ। অপার শান্তি। কুঁই-কুঁই করে একগুচ্ছ ছোট্ট পাখি গাছগুলোর এডাল-ওডালে খেলা করছে। অনেকটা ফিঙে জাতের। আকাশ দিয়ে পাখির বলাকা ডানায় রং মেখে উড়ে যাচ্ছে।

—কী টুকলু! তুমি যে একেবারে মোহিত হয়ে গেছো হে!

—কী হল?

অনন্তবাবু বললেন, সমস্যা! বুঝলে গভীর সমস্যা।

—সমস্যা?

—হ্যাঁ। বাথরুমে জলের কোনও ইয়ে, মানে পাত্র নেই। শুধু টয়লেট পেপার। বুঝলে, আমার একটু বেগ দিচ্ছে। কী করব, বুঝতে পারছি না।

—কী করবেন? যস্মিন দেশে যদাচার, উরস্টারে টয়লেট পেপার।

—ইয়ার্কি মেরো না।...ইয়ে...একবার টিনা ম্যাডামকে বলি?

—বলুন না! ছোট ইয়ে-টিয়ে যদি পান।

অনন্ত সরখেল হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন।

জগুমামা? জগুমামা কোথায়? বাড়ির ভেতরে ঢুকেছেন?

নাঃ, ওই তো। সবুজ ঘাসের ঢাল বেয়ে নীচের দিকে নামছেন। অনেকটা নেমে গেছেন।

হঠাৎ দেখলাম, পাহাড়ি পথ বেয়ে একটা সিলভার গ্রে রঙা মার্সিডিজ ঠিক মামার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দুজন বেশ তাগড়া শ্বেতাঙ্গ নেমে এল। মামার সঙ্গে কথা বলছে। কারা এরা?

নৈঃশব্দের মাঝে ওদের কথাও শোনা যাচ্ছে। আমি নামতে শুরু করেছি।

—আর য়ু প্রফেসর মুখর্জি?

—ইয়া। য়ু?

—উই'র ফ্রম হাভার্ড য়ুনিভার্সিটি। উই'ভ কাম টু টেক য়ু।

—ওয়াট! নাও? হোয়াই?

—উই'ভ বিন ইন্‌স্ট্রাক্টেড সো। প্লিজ কাম।

—ইমপসিব্‌ল। মাই লেকচার ইস অন দ্য ডে আফটার টুমরো। আই'ল কল দেম টুমরো মর্নিং।

—নো স্যর! কাম!

এ কী! লোকদুটো মামার হাত ধরেছে কেন?

—মামা! মামা!

আমার চিৎকার শুনে মামা ফিরে তাকিয়েছেন। লোকদুটো মামাকে টানতে শুরু করেছে। গাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে!

প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম, মামা! আয়াম কামিং! কিডন্যাপিং! কিডন্যাপিং!

মামাও চেঁচিয়ে উঠেছেন, কাম, টুকলু, কাম! স্যানজি! ড্যানিয়েল! কাম উইদ দ্য গান! অ্যারেস্ট দিস গাইস্‌।

লোকদুটো আমায় দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে। একজন পকেটে হাত

দিয়েছে। রিভলবার বার করছে?

ওদিক থেকে একটা বড় গাড়ি এদিকে আসছিল। দাঁড়িয়ে গেছে। দুজন যুবক নেমে এল।

—ওয়াট হ্যাপন্‌ড?

লোকদুটো মামার হাত ছেড়ে দিয়েছে। দৌড়ে গিয়ে মার্সিডিজে উঠে পড়ল। সাঁ করে গাড়িটা বনের পথে নিমেষে উধাও হয়ে গেল।

৬

—খুব খারাপ লাগছে। নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে, বুঝলি!

সামনে চায়ের কাপ। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। আমরা দুজন বসে আছি সঞ্জয়মেসোদের বাড়ির ছোট্ট সবুজ বাগানে। কাছে-দূরে পাহাড়ের মাথায়-গায়ে বাংলো, পাইন আর ঝাউবনে পাখিদের নানা শিসধ্বনি। মেঘলা আকাশ। ঠান্ডা বাতাস বইছে। ওয়েদার ফোরকাস্ট-এ কাল টিভিতে বলেছে, উরস্টারে আজ বিকেলে 'থান্ডার স্টর্ম'। বজ্র-বিদ্যুৎ-বৃষ্টি। মনকেমন করা আজকের সকাল।

জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি।

জগুমামা চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। উদাসগলায় বললেন, আমাদের জন্যে টিনা-সঞ্জয়দের ফ্যামিলি লাইফ ডিস্টার্বড হয়ে গেল।

—ডিস্টার্বড হয়ে গেল?

—হ্যাঁ। নাম্বার ওয়ান, ওদের ছুটি সামনের বৃহস্পতিবার থেকে। আমাদের নিয়ে বেড়াবে। তার জন্যে দুজনেই গত শনি-রবি ফুল ফ্লেজেড অফিস করেছে। এদেশে যখন-তখন ছুটি পাওয়া যায় না। ঘড়ি-বাঁধা জীবন। অথচ আমরা গতকাল থেকে ওদের ঘাড়ে এসে পড়লাম!

—বুধবার পর্যন্ত কি আমাদের ডক্টর দেবের বাড়ি থেকে যাওয়ার কথা ছিল?

—ওবভিয়াসলি! আমার বস্টনের প্রোগ্রাম প্রাণতোষই নেগোশিয়েট

করেছে। নাম্বার টু, আমি যে কারও টার্গেট হয়ে গেছি, এটা ফ্যাক্ট। প্রথমে গ্যাস স্প্রে, তারপরে গাড়িতে তুলে গুম করার চেষ্টা। আমরা এ বাড়িতে আছি মানে যারা আমায় টার্গেট করেছে, তারা এ বাড়িকেও হয়তো টার্গেট করেছে। দে'র আন্ডার থ্রেট। ওদের ছোট্ট মেয়েটা আছে। আমি রিয়্যালি ডিস্টার্বড।

—কিন্তু তোমাকে হঠাৎ টার্গেট করল কেন?

—এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। প্রাণতোষের হার্ট অ্যাটাক হল। তারপরেই আমার ওপর অ্যাটাক।

—আচ্ছা মামা, কাল হাভার্ডে তুমি অ্যাটমিক এনার্জি নিয়ে যে পেপার পড়বে, সেই পেপারে এমন কি কিছু থাকছে যা এদেশের সায়েন্টিস্টদের কোনও চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করাবে?

চ্যালেঞ্জ?—জগুমামা কয়েকমুহূর্ত ভাবলেন। তারপর চোখদুটো একটু চকচক করে উঠল।

—হুঁ। তোর অনুমান বোধহয় ঠিক। আমি মেইলে আমার পেপারের সিনপসিস প্রফেসর টমাস দাভেকে পাঠিয়েছিলাম। অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স-এর চিফ সায়েন্টিস্ট। ন্যাচারালি উনি সেটা সমস্ত বিজ্ঞানীমহলে, যারা সেমিনারে পার্টিসিপেট করছেন, তাদের পাঠিয়েছেন। তোর নিশ্চয়ই মনে আছে, সান্দাকফুতে আমি এই গবেষণাটা করছিলাম। থোরিয়াম অ্যাস অলটারনেটিভ সোর্স অব অ্যাটমিক এনার্জি। ওই ম্যাসাকার হওয়ার পরও গত কয়েকমাস ধরে অন্য জায়গায় নতুন করে ল্যাবরেটরি স্টার্ট করে কাজ করে গেছি। ফাইন্যাল পয়েন্টে এসে গেছি। এই পেপার পড়া মানে এর বাস্তবতা নিয়ে আর প্রশ্ন থাকবে না। রেজিস্টার্ড হয়ে যাবে, চুরিও করতে পারবে না। সুতরাং—

—সুতরাং যারা কালকে ওই 'অ্যাটমিক এনার্জি' সেমিনারে আসছে, তাদেরই কেউ নিশ্চয়ই লোক ফিট করেছে, যাতে ওই পেপার তুমি পড়তে না পারো।

—রাইট। কিন্তু আমরা কবে আসছি, কোথায় থাকছি, সেটা টমাস দাভে ছাড়া কারও জানা সম্ভব নয়।

—উরস্টারে ওদের লোক নিশ্চয়ই আছে। সে আমাদের গতিবিধি জানে।

—গুড লজিক। এই অ্যাঙ্গলে ভাবিনি।

—জগুদা! টুকলু! কী হল? তোমরা বাগানে করছ কী? ব্রেকফাস্ট রেডি।

সঞ্জয়মেসো নীচে নেমে এসেছেন।

—সঞ্জয়, তোমাদের স্কেডেউল কী? কে ছুটি নিচ্ছ, কে যাচ্ছ?

—আপনারা কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন, বলুন তো?...আচ্ছা, আগে চলুন ওপরে। পরোটা, বেগুনভাজা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—মেসো! অনন্তবাবুকে ডাকো। বুড়ো তো বাড়ি তোলপাড় করে ঘুমোচ্ছিল।

—ক-খন তার নাক ডাকা বন্ধ হয়ে গেছে। চা খেয়ে তিনি এখন তৃষার সঙ্গে গেম্‌স খেলছেন।

এদেশে সব রেডিমেড পাওয়া যায়। মালেশিয়া থেকে বানানো পরোটা আসে। ফ্রাইং প্যানে ছেড়ে দিলেই হল। খাস্তা, মুচমুচে, অপূর্ব। বেগুনগুলো আসে মেক্সিকো থেকে। কী মিষ্টি, সুস্বাদু। একটাও বিচি নেই। অতএব অনন্তবাবু বেসিনে হাত ধুয়ে লেগে পড়েছেন।

খেতে-খেতে মামা বললেন, আমাদের প্রোগ্রাম ঠিক করার আগে, বুঝলে, কয়েকটা জরুরি ফোন করতে হবে। হাভার্ডের প্রফেসর দাভের নাম্বার দিচ্ছি। ফোন করো। জানাও, আমরা পৌঁছে গেছি। কাল ক'টায় পৌঁছোতে হবে, রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, ক'টায় লেকচার...সব জেনে নিই।

—আর?

—বাকি ফোন নাম্বারগুলো তোমার কাছে আছে। হসপিটালে খবর নিতে হবে, প্রাণতোষের কন্ডিশন কেমন। ড্যানিয়েলকে জানাতে হবে, আমরা ঠিকঠাক আছি। ও কাল থেকে চব্বিশ ঘণ্টা যে সিকিউরিটির ব্যবস্থা করবে বলেছিল, তারা ফাংশন করছে কি না। পিনাকীকেও একবার ফোন কোরো। আর মিন্টুর সঙ্গে পরে একবার কথা বলতে হবে।

—মামা, একজন বাকি থাকল। জন। পিনাকীর কাছে সব খবর পেয়ে ও নিজে থেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। হসপিটালেও দেখিনি। সাইলেন্ট।

—ঠিক। সঞ্জয়, ওর নাম্বারটা তুমি পিনাকীর কাছে পেয়ে যাবে।

প্রফেসর দাভেকে একবারেই পাওয়া গেল। উনি দারুণ খুশি। মামাকে বললেন, আপনার সিনপসিস পেয়ে সেনসেসন পড়ে গেছে। কাল দশটায় পৌঁছোতে হবে। কিছু ফর্ম্যালিটি আছে। লেকচার দেওয়ার সময় এগারোটা।

আরও বললেন, প্রাণতোষের হার্ট অ্যাটাকের খবর পেয়ে আমরা খুব আপসেট। ভগবানের কাছে সবাই প্রে করছি, হি'ইল গেট ওয়েল সুন। আমরা তো দুশ্চিন্তা করছিলাম, আপনি এখানে আসতে পারবেন কি না।

দ্বিতীয় ফোন, সেন্ট ভিন্টসেন্ট হসপিটালে। সুপার জানালেন, প্রফেসর দেব রিকভারিং। তবে আজকেও আই সি সি য়ু-তে রাখা হবে। কাল থেকে আশা করছি, উনি দেখা করতে পারবেন। সবচেয়ে আশার কথা, সেন্স ফিরে এসেছে। কথাও বলছেন অল্প-অল্প।

তৃতীয় ফোন, ড্যানিয়েল। ড্যানিয়েলের প্লেন ড্রেস্‌ড সিকিওরিটি কাল রাত থেকেই আমাদের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। নো টেনশন। যখন আমরা বেরোব, ওকে তার আধঘণ্টা আগে জানিয়ে দিলেই হবে। ও গাড়ি নিয়ে উইদ প্লেনড্রেসড ফোর্স সঙ্গে থাকবে।

পরোটা পর্ব শেষ করে সামনে ধোঁয়া-ওঠা কফি। অনন্তবাবু অবশ্য এখনও ব্যাটিং চালিয়ে যাচ্ছেন।

মামা অনেকটা শান্ত। কফিতে হালকা চুমুক দিয়ে বললেন, এখনও পর্যন্ত সবক'টাই পজিটিভ নিউজ। প্রাণতোষের খবর শুনে মনটা চনমনে হয়ে গেল। সুতরাং, আজ আমরা প্রথমে য়ুম্যাস যাব। য়ুনিভার্সিটিতে প্রাণতোষের ল্যাবরেটরি দেখব।

—তাহলে তো ভালোই হল। আমি, টিনা দুজনেই ওই ক্যাম্পাসে আছি। প্রফেসর দেবের ল্যাবরেটরি থেকে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং গাড়িতে বড়জোর পাঁচ মিনিট। আপনাদের নামিয়ে আমরা

অফিসে জয়েন করে যাব। আপনার কাজ হয়ে গেলে একটা ফোন করে দেবেন ল্যাব থেকে। টিনা বা আমি চলে আসব। টুকলু, তবুও এই একস্ট্রা চাবিটা রাখো। যদি হঠাৎ কোনও কারণে বাড়ি ফিরে আসতে হয়, তখন লাগবে।

—যা-ক্! এতক্ষণ একটা অপরাধবোধে ভুগছিলাম। তৃষা কোথায় থাকছে?

—ওকে নিয়ে ভাববেন না জগুদা। টিনা এখনই ওকে গোপাদির কাছে রেখে আসবে। ও রোজ বাংলা শেখে গোপাদির কাছে। এখন সামার ভেকেশন চলছে তো।

—নো! নো! আই'ল নট গো। আই'ল প্লে গেমস উইথ জেঠু।

তৃষা অনন্তবাবুর ন্যাওটা হয়ে পড়েছে কিছুক্ষণের মধ্যেই। বেশ কয়েকবার খেলায় হারিয়েছে জেঠুকে। বেচারি একা। সঙ্গী পায় না।

—নো, তৃষা। ইউ'র আ গুড গার্ল! জেঠু কাজে বেরোবেন। রেডি হয়ে নাও। মা তোমায় নিয়ে যাচ্ছে। কুইক। প্লিজ।

—কিন্তু ভাবছি—

—ডোন্ট ওরি জগুদা। টিনা যে গাড়িটা নিয়ে বেরোবে, সেটা খুব কম চলে। কেউ চিনতে পারবে না। তাছাড়া, ড্যানিয়েলের সিকিওরিটির লোক আছে। ওয়াচ রাখছে।

—ঠিক আছে। টিনা ঠিকঠাক ফিরে এলে তবে আমরা বেরোব। ড্যানিয়েলকে বলে দাও, ফরটিফাইভ মিনিটস পরে বেরোচ্ছি।

—ওকে জগুদা।

—তারপর দুজনকে ধরো। পিনাকী আর জন কেরি।

পিনাকী জানাল একই খবর। ডক্টর দেব ইমপ্রুভিং। ও আজকেও ল্যাব যাচ্ছে না। হসপিটালে থাকছে।

মামা বললেন, থ্যাঙ্কয়ু। আমরা কিছু কাজ সেরে হসপিটালে ফিরছি।

—ঠিক আছে আঙ্কল। চিন্তা করবেন না। কাকা ভালো হয়ে উঠবেন।...জানেন, একটা বাজে প্রবলেমে পড়েছি। কাল রাতে হস্টেলে অন্য বন্ধুর সঙ্গে বেড শেয়ার করতে হয়েছে।

—কেন? কী হল?

—আর বলবেন না! মাথার ঠিক ছিল না। আমার সাইড ব্যাগটা কোথায় রেখেছি, খুঁজে পাচ্ছি না। ওর মধ্যে ল্যাপটপ, কাগজপত্র, আমার রুমের চাবি, কাকার বাড়ির একসেট চাবি ছিল। কাল বিকেলে খেয়াল হল। জনকে জিগ্যেস করলাম, ল্যাবে কি ফেলে এসেছি? ও বলল, না। তাই কাকার বাড়ি ঢোকা যাবে কি না, আপনাকে বলেছিলাম। তারপর মনে পড়ল, পরশু রাতে কাকার বাড়ি থেকে ফিরে ওই ব্যাগ থেকে চাবি বের করেই তো রুম খুলেছিলাম।

—স্ট্রেঞ্জ! হসপিটালে খুঁজে দ্যাখো। আর হ্যাঁ, একটু জনের নাম্বার দাও তো। কথা বলি।

জন অনেকবার 'সরি' বলল। বলল, কাল দুপুরে একবার হসপিটালে গেছিল। ল্যাবে কাজের চাপ, দুজন লোক কম। বেরুতে পারছে না। তবে টাইম-টু-টাইম ফোন করে দেবের খোঁজ নিচ্ছে। মামাকে ল্যাবে ইনভাইট করল। নতুবা বিকেলে অবশ্যই হসপিটালে যাবে।

চটপট চান-টান সেরে তৈরি হয়ে নিয়েছি। কাল থেকে অনন্তবাবু তোবড়ানো জলের বোতল দিয়ে 'কাজ' সারছেন! গ্যারাজে গাড়ির শব্দ। টিনামাসি নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছে।

ড্যানিয়েল এবার 'বেল' টিপছে। সঞ্জয়মেসো নেমে গেলেন। পরপর আমরা। সবশেষে টিনামাসি। লক টেনে দিল।

পিটপিট বৃষ্টি শুরু হয়েছে। দমকা বাতাস। পাহাড় থেকে নেমে চওড়া সড়কে দুবার পাক খেয়েই ঢেউ খেলানো সবুজ প্রান্তর। চারিদিকে বাউন্ডারি। চারতলা বিল্ডিং-এর গায়ে জ্বলজ্বলে সাইনবোর্ডে লেখা 'য়ুনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস'। পাশ দিয়ে বিরাট গেট।

সঞ্জয়মেসো বললেন,—এটাই আমাদের অফিস। ওই যে ছোট-ছোট দোতলা বাড়ি, ওগুলো এক-একেকটি ডিপার্টমেন্ট। একতলা বাংলোগুলো দেখছেন, একেকজন সায়েন্টিস্টের ল্যাব।

ড্যানিয়েলের গাড়ি ভিতরে ঢোকেনি। ও আজ উর্দিহীন। আমাদের গাড়িতে উঠেছে। আমাদের চারজনকে নামিয়ে মেসোরা চলে গেল।

ডানদিকে ল্যাব। তিন-চারজন কাজ করছে। বাঁ-দিকে পরপর দুটো

চেম্বার। একটা ফাঁকা। একটি ভারতীয় মেয়ে এসে জনের চেম্বারের দরজা খুলে দিল।

বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস। টাকমাথা। গোলগোল, হাসিখুশি চেহারা। জন কম্পুটারে কাজ করছিলেন। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন, হাই!

মামা পরিচয় দিলেন। আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডসেক হল। ড্যানিয়েলকে পরিচয় করালেন টমাস দাভের ছাত্র হিসাবে। মামাকে বস্টন থেকে নিতে এসেছে।

—চলো। তোমাদের ল্যাবটা একটু ঘুরে দেখাই। কফি খাবে?

কফি হাতে আমরা ঘুরছি। বিচিত্র সব যন্ত্র, নানা-চেহারার মাইক্রোস্কোপ।

—রিসার্চ সাকসেসফুল হবে কি জন?

—আয়াম নট হোপফুল। আমার মনে হচ্ছে, আমরা বুনো হাঁসের পেছনে ছুটছি।

—ইস ইট সো?

ড্যানিয়েল ল্যাবরেটরির শেষপ্রান্তে টয়লেটের দিকে গেল। টয়লেটের আগে টেবিলে স্তূপাকৃতি ফাইল, কাগজ।

—চলো জন, ভিতরে বসি।

—চলো।...তোমরা কি এখান থেকেই হসপিটাল যাবে?

—হ্যাঁ। কারণ বিকেলের মধ্যে প্রফেসর দাভের বাড়ি পৌঁছোতে হবে।

—তোমার সঙ্গীরা?

—ওরা দুজন থেকে যাবে।

—প্রফেসর মুখার্জি, আমি তোমাকে ডিনারে ডাকব ভেবেছিলাম। প্রফেসর দেব তোমার কথা এত বলতেন। উনি অসুস্থ। তুমি আমাদের গেস্ট।

—আরে না-না। এরকম পরিস্থিতি হবে, কেউ কি ভেবেছিল?

—একটা কথা বলব? আমার ফ্ল্যাট খুব কাছে। তুমি যদি আমার সঙ্গে আজ লাঞ্চ করো, খুব খুশি হব।...অন্যভাবে নিও না, তোমার

বন্ধুদেরও ডাকতাম। কিন্তু আমি একা থাকি। লিমিটেড রিসোর্স।

—তারপর? লাঞ্চ সেরে?

—সিম্প্‌ল। তোমায় আমি হসপিটালে নামিয়ে দেব। ওরা নিজেদের মতন ঘুরে ওখানে পৌঁছে যাক।

জগুমামা একসেকেন্ড ভেবে বললেন, ওকে। চারটের মধ্যে কিন্তু হসপিটালে পৌঁছোতে হবে।

—নো প্রবলেম। আমি তাহলে গাড়ি নিয়ে আসি। জাস্ট দু-মিনিট ওয়েট করো।

জন বেশ উৎসাহের সঙ্গে টেবিল থেকে চাবির রিং নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

জগুমামা একসেকেন্ড আমার দিকে তাকালেন।

তারপর অতি দ্রুত উলটোদিকে চলে গেলেন। জনের সিটে বসে টেবিলের ড্রয়ার টানলেন। হাতড়ে-হাতড়ে কিছু একটা বের করে চট করে পকেটে ঢোকালেন। একটা চাবির রিং অনন্তবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, পকেটে ঢোকান। কুইক। পিনাকীকে দেবেন।

অনন্ত সরখেল ভ্যাবাচাকা খেয়েও সামনে নিলেন।

—টুকলু, ড্যানিয়েল কোথায় গেল রে?

তখনই ড্যানিয়েল ঢুকল। ভাবলেশহীন মুখে বলল, আপনি যা বলেছিলেন, তাই।...পেয়ে গেছি। প্রিন্ট নিয়ে নিয়েছি।

—গুড। শোনো, আমি জনের সঙ্গে লাঞ্চে যাচ্ছি।

—ইয়েস সার।

জন ফিরে এসেছে। বলল, চলুন প্রফেসর।

—জাস্ট ওয়েট ফর মিনিটস। আমার রিলেটিভ এখানেই সার্ভিস করে। ডেকেছি, আসছে।

মেসোর গাড়ি এসে গেছে। আমরা তিনজন উঠে বসলাম। মামা জনের হন্ডাসিটিতে।

দুটো গাড়িই পরপর মেন গেটের সামনে। ড্যানিয়েল সঞ্জয়মেসোকে থামাতে বলল। টুক করে নেমে গেল। আমাদের গাড়ি বাঁ-দিকে ঘুরল। তার আগেই জনের হন্ডাসিটি ডানদিকের রাস্তায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

*

গাছ-গাছালিতে ছায়াছন্ন মনোরম পথ। দু-ধারে নিটোল বাগান ঘেরা ছোট-মাঝারি সব বাড়ি।

প্রায় দশমিনিট যাওয়ার পরে জন গাড়ি থামাল।

—এসো প্রফেসর। এটাই আমার ফ্ল্যাট।

—বাঃ! ভারি সুন্দর। একা থাকো?

—হ্যাঁ। উপায় নেই। বউ বস্টনে স্কুলে পড়ায়, ছেলে ওই স্কুলেই পড়ে। উইক-এন্ডে আমরা প্রায়ই মিট করি।

—ওরা আসে?

—ভাইসি ভার্সা। প্রফেসর, একটা চিল্‌ড কোক খান।

—নো, থ্যাঙ্কস।...চলো, তোমায় লাঞ্চ রেডি করতে সাহায্য করি।

—কোনও তাড়া নেই প্রফেসর। আপনাকে পেয়েছি। ঠিক করে ফেললাম, সারাদিন আপনার সঙ্গে গল্প করব।

—সো নাইস অব য়ু। আমিও আজ অনেকটা রিল্যাক্‌সড। খেয়ে-দেয়ে বিকেলের দিকে হসপিটালে যাব।

—কোথাও যাব না স্যার।

—মানে?

—মানে খুব সিম্প্‌ল। আজ দিনরাত, অর্থাৎ নেক্‌সট চব্বিশ ঘণ্টা আপনি আমার সঙ্গেই কাটাবেন।

—ওয়াট?

—হ্যাঁ প্রফেসর। কাল সকাল দশটায় আপনাকে ছেড়ে দেব। আপনার রিলেটিভের বাড়িই নাহয় পৌঁছে দেব। ব্যস, আমার অ্যাসাইনমেন্ট শেষ।

—তুমি কি বলতে চাইছ? কাল দশটায় হাভার্ডে আমার স্পিচ!

—সেইজন্যেই তো এখানে থাকবেন। এত সোজা কথাটা বুঝতে এত সময় লাগছে কেন? সত্যিই আপনি বড্ড ভালো লোক। নইলে একা-একা কখনও আমার সঙ্গে চলে আসেন!

—তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে জন। এর ফল তুমি জান?

—কী হবে? আপনি কমপ্লেন করলে তদন্ত হবে। বড়জোর আমায় সাসপেন্ড করবে, তাই তো? আই কেয়ার আ ফিগ! প্রমাণ করবে কী করে, বলুন? ফিজিক্যালি অ্যাসল্ট করছি না।

—আমি, আমি এখনই বেরিয়ে যাব! দেখি, কী করে আটকাও। ঠিক খুঁজে নেব।

—আর বোকামি করবেন না প্লিজ। কুড়ি মাইলের মধ্যে কোনও শপ বা অফিস নেই। এটা গ্রাফটন শহর। এখন সবাই কাজে, বাড়ির বাইরে। হেদিয়ে মরলেও কেউ এগিয়ে আসবে না। তাছাড়া শুধুমুধু এরকম ঝামেলা করলে—

একটু থেমে জন হঠাৎ কঠিন গলায় বলল, আমায় ওরা একটা রিভলবার দিয়েছে। এমার্জেন্সির জন্যে।...এই দেখুন।...বেশি বাড়াবাড়ি করলে এক অচেনা লাশ কয়েকদিন পরে কোনও একটা লেকে ভেসে উঠবে। আশেপাশে অনেকগুলো লেক।

জগুমামা ঠান্ডাচোখে জনের দিকে তাকালেন। বললেন, তাহলে একটা কোক দাও। গলাটা একটু শুকিয়ে গেছে। আচ্ছা, তুমি এই অ্যাসাইনমেন্টটা নিলে কেন?

—মানি! সিম্পলি পর মানি। দে হ্যাভ অলরেডি পেড মি ফিফটি থাউজ্যান্ড বাক্স। বাকি ফিফটি থাউজেন্ড কাল দেবে। দে টোল্ড মি, আপনার পেপার রেজিস্টার্ড হলে আমাদের দেশের নাকি ক্ষতি হয়ে যাবে। রাইট নাও, আমার টাকার খুব দরকার।

—ওরা কারা?

—নামগুলো বলা যাবে না। সরি প্রফেসর। সত্যি-সত্যি ওদের নাম জেনে ফেললে আপনাকে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। সেটা আমি মোটেই চাইছি না।...নিন, কোক খান। আমি একটা মিল্ক শেক নিচ্ছি। ভালো ডিভিডি আছে। দেখবেন?

ডিং-ডং-ডিং। কলিংবেল বেজে উঠল। জন একবার মামাকে দেখল। তারপর সেন্টার টেবিল থেকে রিমোট তুলল। রিভলবার ডান হাতে, বাঁ-হাতে রিমোট। মামার ডানদিকে গা ঘেঁষে বসে পিঠে রিভলবার ঠেকাল, রিমোট টিপল। লক খোলার শব্দ হল।

—কাম ইন।

দুজন লোক। একজনের হাতে ব্রিফকেস।

—কে তোমরা? কী ব্যাপার?

—তোমায় বাকি টাকা পেমেন্ট করতে এসেছি। প্রফেসরকে হাভার্ডে নিয়ে যাব।

—এরকম তো কথা হয়নি।

—পরে ঠিক হয়েছে।

—এনেছেন?

—এই যে। খুলে দেখুন।

জন রিভলবার পকেটে ঢুকিয়ে হাত বাড়াল। কোলের ওপর রেখে ব্রিফকেসে চাপ দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয়জন সোজা রিভলবার ধরল জনের মাথায়।

—হাত তোলো!

প্রথমজন ওর পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভলবারটা বের করে নিল।

—চলো।...বাইরে।...আসুন প্রফেসর।

অ্যাকশানটা ঘটতে সময় নিল মাত্র দেড় মিনিট।

বাইরে একটা গাড়ি। হেলান দিয়ে ড্যানিয়েল। মুচকি-মুচকি হাসছে।

৭

চক্র। ভিসিয়াস সার্কল।—জগুমামা থেমে-থেমে বললেন।

—চক্র?

—হ্যাঁ। মোটেই আশ্চর্য হব না, যদি এই চক্রের সঙ্গে স্টেটস্-এর প্রশাসনের কেউ যুক্ত থাকে। কারণ, এরা চায় না, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশ অ্যাটমিক রিসার্চ করুক। অ্যাটমিক এনার্জির রেডিমেড সোর্স য়ুরেনিয়াম মুষ্টিমেয় কয়েকটা দেশের আছে। অল্টারনেটিভ সোর্স যদি ফিনানসিয়ালি ভায়াবল হয়, তবে এদের মাস্তানি থাকবে না। ওরা জানত না, ম্যাসাকারের পরেও আমি যে রিসার্চ চালিয়ে যাচ্ছি। দাভের

মেইল থেকে আমার পাঠানো সিনপসিস পড়ে চক্রের পান্ডাগুলোর মাথা খারাপ হয়ে গেল। সেমিনারে পেপার রেজিস্টার্ড হয়ে গেলে সারা পৃথিবীর সায়েন্টিস্ট মহল জেনে যাবে, থোরিয়াম দিয়ে ভারত অ্যাটিমিক এনার্জি পেতে চলেছে। তাই ঠিক করল, আগে আটকাও। নিজেদের দেশে ভারতীয় সায়েন্টিস্টের শারীরিক কিছু হলে হইচই পড়ে যাবে। দেশে ফেরার পরে হয়ত বাকি কাজটা করত। জেবি মুখার্জি ঘচাং—ফু!

—জনের কাছ থেকে যে চারজনের নাম পাওয়া গেছে, চারজনই কি বিজ্ঞানী?

—হ্যাঁ। যথেষ্ট নামি এবং দামি। তবে আমার ধারণা, এর পরের লেভেলের খোঁজ পুলিশ আর পাবে না।

—পাবে না?

—না। এফ বি আই তদন্তের ভার নেবে। তারপর একদিন হঠাৎ চারজনই গায়েব হয়ে যাবে। সাংঘাতিক হিংস্র এরা। আসলে কি জানিস—

এইসময় লিফট থেকে নেমে লাউঞ্জে তরুণী নার্স এসে দাঁড়ালেন।

—মে আই নো, হু'স প্রফেসর মুখার্জি?

জগুমামা উঠে দাঁড়ালেন।

—বি সিটেড প্লিজ। প্রফেসর দেবকে খাওয়ানো হচ্ছে। আর একটু ওয়েট করুন। আমরা ডেকে নিয়ে যাব।

—কেমন আছেন উনি?

—মাচ বেটার। র‍্যাপিডলি ইমপ্রুভিং। কথা বলছেন আস্তে-আস্তে। আপনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ছটফট করছেন।

—ওর ভাইপো পিনাকী কোথায়?

—সকালে এসেছিলেন। কথা বলেছেন। ন'টা নাগাদ বেরিয়ে গেছেন।...প্লিজ, একটু ওয়েট করুন।

তরুণী মহিলা লিফটে উঠে পড়লেন।

—হ্যাঁ, যে কথাটা বলছিলাম। আমার মনে হয়, এই দেশটার দুটো মুখ আছে। একটা মুখ শান্তির, সহনশীলতার। কালো, সাদা, হলুদ,

বাদামি নানারঙের ভাষার-জাতের মানুষ এখানে সুখে-শান্তিতে আছে। রাষ্ট্র তাদের ভালো রাখার জন্যে সবসময় চেষ্টা করছে। আর একটা মুখ হিংস্র। সেই মুখটা পৃথিবীর অন্য দেশের দিকে ফেরানো। কোনও দেশকে এরা এগোতে দিতে চায় না। টুকরো-টুকরো করে দিতে চায়। যুদ্ধ বাধাতে চায়। যেমন ইরাক-আফগানিস্তান। তার আগে রাশিয়া, কিউবা, প্যালেস্তাইন, ভিয়েতনাম।

—তুমি কি জনকে সন্দেহ করেছিলে?

—ঠিক সন্দেহ করিনি। পরে সন্দেহটা হল। আসলে দেখা গেছে, যে-কোনও অপরাধের কোথাও-না-কোথাও চিহ্ন থেকে যায়। হ্যালোথেন গ্যাস সিলিন্ডার ডাক্তার বা গবেষক ছাড়া যে-কেউ পাবে না। ড্যানিয়েলের সঙ্গীরা প্রাণতোষের শোওয়ার ঘর থেকে যখন পোর্টেবল সিলিন্ডার উদ্ধার করে আমায় দিল, আমি নেড়েচেড়ে দেখলাম, একেবারে নীচে ছোট্ট 'য়ুম্যাস'-এর স্টিকার লাগানো আছে। সন্দেহ করলাম পিনাকীকে। ও রিক্যুইজিশন করিয়েছে। কিন্তু অঙ্ক মিলছিল না। হ্যালোথেন স্প্রে করবে কেন? আমাদের সঙ্গে ওর কি শত্রুতা? কাকাকে মারার জন্যে স্প্রে করলে আগের রাতে, লুকিয়ে ফিরে এসে, করতে হয়। তাতে কিন্তু হার্ট অ্যাটাক হয় না। তারপর—

একটু থেমে বললেন। পরশু সকালে পিনাকী যখন বলল, চাবি পাচ্ছে না, তখন হালকা সন্দেহ হল। য়ুম্যাসের স্টোর থেকে রিক্যুইজিশান বাইরের কেউ করতে পারবে না। তার আগের দিন আমায় কিডন্যাপের চেষ্টা হয়েছে। মোটিভটা আন্দাজ করা গেছে। ড্যানিয়েলকে বলে রাখলাম। জনের টেবিলের নীচের ড্রয়ার থেকে পেয়ে গেলাম দু-সেট চাবি। প্রাণতোষের বাড়িরটা পকেটে ঢোকালাম। পিনাকীর হস্টেলেরটা দিলাম অনন্তবাবুকে। এর মধ্যে টয়লেটের পাশের কম্পুটারটা খুলে রবিবারের রিকুইজিশন স্লিপটা দেখতে পেয়ে গেল ড্যানিয়েল। জনের আমায় বাড়ি নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ দেখে তার আগেই আমি বুঝে গেছি।

—কিন্তু হ্যালোথেন স্প্রে করল কখন?

—কেন, সকালে। ও বন্ধুকে বলে রবার্টকে হয়তো ফিট করিয়ে

ছিল, আমাদের ওর বাড়ি নিয়ে আসতে। দুদিন আটকে রাখত। প্রাণতোষ জানতেও পারত না। কিন্তু পিনাকী যখন কাকার হার্ট অ্যাটাকের খবর পেয়ে ব্যাগ ছেড়ে চলে গেল, তখনই ওর মাথায় স্প্রে করার বুদ্ধি আসে। স্টোরে রিকুইজিশান পাঠায় এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রাণতোষের বাড়ি এসে ঢোকে। ভুলটা করে ফেলে শোবার ঘরে সিলিন্ডার রেখে গিয়ে। উত্তেজনা, তাড়াহুড়োয় বোধহয় ভুলে গেছিল।

—ড্যানিয়েল ঠিক ফলো করে জনের বাড়ি পৌঁছে গেছিল।

—ফলো করবে কেন? জনের ঠিকানা পেয়ে গেছিল য়ুম্যাসের প্রিন্টআউট থেকে। তারপর ওই রোড-গাইড যন্ত্রে টাইপ করে—

প্লিজ কাম।—নার্স ভদ্রমহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। আমরা লিফটে ঢুকে পড়লাম।

আই সি সি য়ু নয়। সুন্দর পরিচ্ছন্ন কেবিন। সেন্ট্রাল অডিও সিস্টেমে মৃদু মিউজিক বাজছে। টিভিও আছে। সাদা চাদরে বুক পর্যন্ত ঢেকে পক্ককেশ যে ভদ্রলোক আধশোয়া, তিনিই প্রফেসর প্রাণতোষ দেব। মামাকে দেখে তাঁর মুখে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল।

মামা হাসিমুখে বললেন, গুড মর্নিং মাই ফ্রেন্ড।

—মর্নিং।...বোসো।...কাল কেমন হল তোমার লেকচার?

—খুব প্রশংসিত হয়েছে। অ্যাডভান্স পেটেন্টের কথাবার্তাও হয়ে গেল। তবে তার আগে একঘণ্টা বিজ্ঞানী-শ্রোতারা প্রশ্নে-প্রশ্নে আমায় জেরবার করার চেষ্টা করেছে। প্রত্যেকটার জবাব দিতে পেরেছি, এটাই আমার স্যাটিসফ্যাকশন। তোমার প্রেস্টিজ রাখতে পেরেছি।

—তুমি পারবে। আমি জানতাম।

একটু থেমে ধীরে-ধীরে বললেন, আজ পিনাকীর কাছে জনের খবরটা শুনলাম।..মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। অনারারিয়াস পায়। তবু টাকার লোভ!

ওটাই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের রোগ।—জগুমামা হেসে বললেন, ওসব ছাড়। পাস্ট ইস পাস্ট। তুমি এই রোগটা বাধালে কী করে? এদেশে থাকো। নিয়মিত চেক-আপ হয়। ধরা পড়েনি?

—না রে ভাই। হার্টের কন্ডিশন ওয়স অ্যাবসলিউটলি গুড। নো

ব্লকেজ, নাথিং। একসপ্তাহ আগেই রুটিন চেক-আপ হয়েছিল।

—তাহলে?

—ভয়! বুঝলে জেবি, প্রচণ্ড ভয়।—নীচুগলায় কেটে-কেটে বললেন প্রফেসর, জীবনে এমন ভয় আমি কখনও পাইনি।

—ভয়? কীসের ভয়?

—কী বলব, বলো তো! বিশ্বাস করবে? ভূতের ভয়? হ্যাঁ, আমি... আমি অশরীরীর ডাক নিজের কানে শুনেছি। একবার নয়, বারবার।

—তুমি শুনেছ?

—হ্যাঁ। তার আগে বলে নিই, আমি চোর-ডাকাত, সাপখোপে কোনওদিন ভয় পাই না। একটা ব্যাপারেই আমার দুর্বলতা। ভূতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু ভয় পাই। ছোটবেলা থেকেই। হস্টেলে থাকতে বন্ধুরা অনেকবার ভয় দেখিয়েছে। মজা করেছে।...তারপর বহুদিন কেটে গেছে। এদেশে কখনও কোনওদিন অশরীরী-ভয় পাইনি। প্রায় দশবছর এই বাড়িতে আমি একা থাকি। পিনাকী প্রথম এসে মাঝে কয়েকমাস ছিল। তাও প্রায় বছরপাঁচেক হয়ে গেল। কিন্তু সেই রাতে অন্ধকারে আমি...

আধশোয়া অবস্থাতেই টেবিলে নল-লাগানো বোতলের দিকে ইশারা করলেন। ড্যানিয়েল এগিয়ে দিল। শোঁ-শোঁ করে খানিকটা জল খেলেন।

তারপর বললেন, পুরোপুরি ভৌতিক ঘটনা!...আমি প্রত্যক্ষদর্শী। অশরীরীর উপস্থিতি টের পেয়েছি। তার ডাক শুনেছি। উঃ, সে যে কী ভয়ঙ্কর বিভীষিকা।

—উঃ! ব্বাপ্‌রে! অ্যামেরিকান ভূত!

অনন্ত সরখেল উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

—কী ঘটেছিল, মনে করে করে বলো তো ভাই। নো টেনশন।

—বলছি। তবে বিশ্বাস করা-না-করা তোমাদের ওপর। শনিবার ডিনার সেরে ভাইপো চলে গেল সাড়ে দশটায়। অন্যদিন সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত বই পড়ি বা টিভি দেখি। সেদিন পৌনে এগারোটায় শুয়ে পড়লাম। আমার ঘুম পাতলা। ইনসমনিয়া নেই। বিছানায় গেছি,

ঘুমিয়েও পড়েছি। তখন কত রাত জানি না! আচমকা বিকট ডাকে ঘুম ভেঙে গেল।

—বিকট ডাক?

মাগো!—ফের অনন্তবাবু।

—হ্যাঁ। বিকট ডাক। বিকৃত ভাঙা-ভাঙা গলায় অ্যাম্যারিকান প্রোনানসিয়েসনে আমায় ডাকছে। ঘরের মধ্যে দপ্‌দপ্‌ করে নীল আলো জ্বলে উঠছে!

ও মাই গড!—ড্যানিয়েল অস্ফুটে বলল।

—আমি...আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, ঘরের মধ্যে কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে। সে ডাকছে, কাম...কা-ম...প্র্যান্‌টোস...কা...ম...!

—তারপর?

—আমার তো অবস্থা বুঝতেই পারছ! বিছানায় মিশে আছি। বেড সুইচটা টিপব, তারও শক্তি নেই। বারপাঁচেক ডেকে সে থেমে গেল। আলোও বন্ধ হয়ে গেল।

—তারপর?

—দশ সেকেন্ড পরেই আবার...আবার! আবার সে আমায় ভাঙা খোনা গলায় ডাকছে...এসে দাঁড়িয়েছে আমার বিছানার পাশে!

ও-ফ্‌!—অনন্তবাবু দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেলেন।

—তুমি দেখেছ কাউকে? ভালো করে ভেবে বলো!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। তার প্রেসেন্স টের পেয়েছি!...উঃ, সে যে কী ভয়ঙ্কর ডাক...'কাম...কাম...প্র্যান্‌টোস...কাম...বীভৎস গলা! সঙ্গে-সঙ্গে আলো নাচছে...!

—তারপর?

—মনে হল, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। বুকের মধ্যে হাজার-হাজার পিন ফুটছে। ঘামছি...শরীর অবশ। চোখ ঝাপসা। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, সে আমায় বাঁচতে দেবে না...আমি মরে যাচ্ছি। কখন, কীভাবে যে এসওএস ফোনটার বোতাম টিপেছি, জানি না!

একটু থেমে বললেন, বাড়িটা আমায় বিক্রি করে দিতে হবে। ও বাড়িতে আর থাকতে পারব না। এখন দাম পাব না। রিসেসন

চলছে।...কিছু করার নেই। বাড়ির কথা ভাবলেই সেই রাতের ছবিটা ফুটে উঠছে। শিউরে উঠছি।

—কুল ডাউন প্রাণতোষ। এখনই অতদূর পর্যন্ত ভাবার দরকার নেই। একটু ভাবতে দাও।

—ভাবাভাবির কিছু নেই। প্রাণ আগে, না প্রপার্টি আগে। আই'ভ মেড আপ মাই মাইন্ড। জান, প্রথম যখন সায়েবরা এসে এই ইস্টকোস্টে সেট্‌ল করে, তখন রেড ইন্ডিয়ান ট্রাইবদের সঙ্গে ওদের মারামারি লেগে থাকত। দু-পক্ষই মরত।...এসব জায়গায় কত যে ডেডবডি কবর দেওয়া হয়েছে। আমি সিওর, তাদেরই কোনও অতৃপ্ত আত্মা...

—এসে তোমায় ধরেছে। প্রায় চারশো বছর পরে! প্রাণতোষ, তুমি একজন সায়েন্টিস্ট। বি লজিকাল অ্যান্ড প্র্যাগমাটিক। এনিওয়ে, আমার দু-একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?

—বলো।

—তোমার এই ভূতের ভয় পাওয়া আর কেউ জানে?

—না। এদেশে কেউ জানে না। তবে দেশে, বাড়ির আত্মীয়স্বজন জানে। দাদা, দিদি ঠাট্টা-ইয়ার্কিও করেছে একসময়। এখনও দেখা হলে করে।

—এর মধ্যে কেউ দেশ থেকে এসেছিল?

—মাসদুয়েক আগে দিদি-জামাইবাবু এসেছিলেন। প্রথমবার বেড়াতে। আমিই টিকিট কেটে পাঠিয়েছিলাম। প্রায় মাসখানেক ছিলেন। খুব মজা-আড্ডা-ইয়ার্কি হয়েছিল সেই ক'দিন।

—তোমার ভূত-দুর্বলতা নিয়ে কথা হয়েছিল?

—হ্যাঁ—। দিদি ঠাট্টা করে বলছিল, 'তুই এতবড় বাড়িতে একা থাকিস কী করে? দেশে লাইট নিভিয়ে ঘুমোতে পারতিস না। এখনও তোকে ভূতে ধরেনি?' আমি বলেছি, 'অ্যাম্যারিকা অনেক সিভিলাইজড। তাই ভূত সব অন্যদেশে চলে যায়।'

—দ্বিতীয় প্রশ্ন, তোমার বাড়ির চাবির একসট্রা সেট আর কারও কাছে আছে?

—না। আমার, পিনাকীর আর মার্গারেটের কাছে ট্রিপলিকেট সেট। ফর এমার্জেন্সি।

—হ্যাঁ। ওই সেট দিয়েই ঢুকেছিলাম। প্রথম দিন। অনেক জেরাটেরার পরে। এবং গ্যাসের খপ্পরে পড়েছিলাম।

—মার্গারেট খুব ভালো। তেমনি কড়া। কনফার্ম না হলে ঢুকতেই দেয় না।

—কেন? পিনাকী? সেও এ ক'দিন তোমার জন্যে দিনরাত হসপিটালে পড়ে থেকেছে।

—হ্যাঁ। ছেলেটা...

—ঠিক আছে। তুমি রেস্ট নাও। চলো ড্যানিয়েল। প্রফেসর দেবের বাড়ি আরেকবার খানা-তল্লাসি করে আসি।

৮

—স্যার প্লিজ! যাওয়ার পথে আমায় সঞ্জয়বাবুর বাড়ি নামিয়ে দিন।

—সঞ্জয়দের বাড়ি! মানে ঊরস্টারে? আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন না?

—না স্যার। আমারও হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে স্যার। উঃ, কী সাংঘাতিক! সায়েব ভূতের বাড়ি! ভাবলেই শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে স্যার। যাব না স্যার।

—আপনি একা সঞ্জয়দের বাড়ি থাকতে পারবেন তো?

—একা!

—হ্যাঁ, একা। কারণ সঞ্জয়-টিনা এখন য়ুম্যাসে। তৃষা গেছে বাংলা পড়তে। বাড়িতে কেউ নেই।

—তা হোক স্যার। তবু ওই ভূতুড়ে বাড়ির চেয়ে—

—অশরীরীরা কি একজায়গায় থাকে অনন্তবাবু? সূক্ষ্ম শরীর, যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারে এক সেকেন্ডে। ওরা যদি সত্যিই আপনাকে ধরতে চায়, তবে ঊরস্টারে গিয়ে আপনি বাঁচতে পারবেন?

একেবারে একা, অতবড় বাড়ি। কোথাও কেউ নেই।

—উরিব্বাপ্! স্যার, আপনি আমায়—

—উহুঁ! ভয় দেখাচ্ছি না। যুক্তি দেখাচ্ছি। মানা-না-মানা আপনার ওপর। এখানে আমরা সবাই আছি, ওখানে আপনি একেবারে একা। আরেকবার ভেবে দেখুন।

অনন্ত সরখেল কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থাকলেন। তারপর কুঁইকুঁই করে বললেন, ঠিক আছে স্যার। তবে আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকছি না...কী বিপদ, কী বিপদ!

তারপর গুম মেরে গেলেন।

জগুমামা বললেন, বুঝলে ড্যানিয়েল, যা কিছু লুকিয়ে আছে ওই ঘরের ভেতরে।

—আর য়ু সিওর স্যর? ওইদিন সকালেই পিনাকীর ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে জন ঢুকেছিল।

—সে ঢুকেছিল নিজের কাজ সারতে। তার সিঙ্গল পয়েন্ট অ্যাজেন্ডা ছিল আমায় আটকানো। আমি যাতে হাভার্ড ঠিকসময়ে না পৌঁছোতে পারি। তার সঙ্গে প্রাণতোষের হার্ট অ্যাটাকের কোনও সম্পর্ক নেই। হয় আমায় বিশ্বাস করতে হয়, সত্যিই সেই রাতে প্রাণতোষকে ভূতে ধরেছিল, নয় তাকে ভয় দেখিয়ে মারতে চাওয়া হয়েছিল।

—মারতে চাওয়া হয়েছিল? কেন?

—সবচেয়ে স্ট্রং মোটিভ হচ্ছে, সম্পত্তি। প্রাণতোষ এখনও পর্যন্ত বায়োটেকনোলজিতে প্রায় পনেরোটা ইনভেনশন করেছে। সবগুলোই পেটেন্টেড। প্রতিবছর ডলারে হিউজ রয়্যালটি পায়।

—তুমি কি বলতে চাইছ—

—এখনও কিছুই চাইছি না। লেট'স গো অ্যান্ড ইনভেস্টিগেট।

গাড়ি এসে থামল প্রাণতোষ দেবের বাগানঘেরা বাড়ির সামনে।

আর একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সেই গাড়ি থেকে বিরাট চেহারার যে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষটি নেমে ড্যানিয়েলকে স্যালুট দিল, তাকে চিনি। প্রথমদিনও সে ছিল সঙ্গে।

বাড়ির সামনে আরও চারজন সাদা পোশাকের পুলিশ দাড়িয়েছিল। তারা দ্রুত নিজস্ব চাবি দিয়ে বাড়ি খুলে দিল।

অনন্তবাবু বাগানে আছেন। ভেতরে ঢোকেননি।

খট্-খট্-খট্। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি। প্রাণতোষবাবুর মুখে শোনার পর থেকে একটু ছমছম করছিল শরীর।

আমরা সেদিন বেরিয়ে যাওয়ার পরে আর কেউ ঢোকেনি নিশ্চয়ই?—জগুমামা বললেন। আমরা এখন শোওয়ার ঘরে।

—কোয়েশ্চেন ডাস নট অ্যারাইস স্যর!

—গুড।...পরদাগুলো সরিয়ে দাও। আলো আসুক।

তীক্ষ্ণচোখে মামা তাকিয়ে আছেন। কোমরে হাত।

বিছানা কিছুটা এলোমেলো। ব্ল্যাঙ্কেট, চাদর ঝুলে পড়েছে খাটের একপাশে। বালিশটা কুঁচকে আছে। জানলার দিকে মাথা রেখে শুতেন প্রাণতোষ। দরজার বাঁ-দিকে টিভি। শুয়ে শুয়ে দেখা যায়। খাটের পাশে বক্স-এ একটা রিমোট। মোবাইল ফোন। একটা নোটপ্যাড। পেন।

মামা ফোনটা তুলে নিলেন। এখনও চালু। মিস্‌ড কল দেখা যাচ্ছে। টেপাটেপি করছেন।

কল্পনা করার চেষ্টা করছি, সে রাতে ঠিক কী ঘটেছিল। আবার গা কেঁপে উঠল।

আলো জ্বলছে দপ্‌দপ্ করে...কেউ ভাঙা বিকৃতকণ্ঠে ডাকছে...

টিভির নীচে ক্যাবিনেটে সাউন্ড সিস্টেম। বন্ধ। উপরে ছোট্ট ডিভিডি প্লেয়ার। বন্ধ। ঘরের উপরের দু-কোণে দুটো বড় শেল্‌ফে সাউন্ড বক্স। তার নীচে দুদিকে আরও একটা করে তাক। একটায় সুদৃশ্য ইলেকট্রনিক ঘড়ি। টিক্‌টিক্। চলছে। অন্যদিকের তাকে কাচের ফুলদানি। সিন্থেটিক একগুচ্ছ রঙিন ফুলের ঝাড়।

ড্যানিয়েলের অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার ক্যাবিনেট খুলে দেখছেন।

ঘরে আর কিছু নেই। মেঝেতে একজোড়া স্লিপার। একটু দূরত্বে।

এখান থেকেই স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অচেতন প্রফেসরকে।

জগুমামা দেখছেন ঘড়িটাকে। উলটে-পালটে। রেখে দিলেন।

টিভির পাশে সাউন্ড সিস্টেমের রিমোট। অফিসার চালিয়ে দিলেন। অমনি দুদিকের সাউন্ড বক্সে বেজে উঠল, '...যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে...জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে...।'

কাঁটা দিল শরীরে। পৃথিবীর এই অন্যপ্রান্তেও বাঙালির অবসরের সঙ্গী রবীন্দ্রনাথ।

দেবব্রত বিশ্বাস গেয়ে চলেছেন, 'সব যে হয়ে গেল কালো, নিবে গেল দীপের আলো...আকাশপানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে...

এই গানগুলিই সিডিতে শেষ শুনেছিলেন প্রাণতোষ। ঘটনার সঙ্গে কী অদ্ভুত মিল! তবে শনিবার রাতে নিশ্চয়ই নয়। সেদিন সোজা বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছিলেন।

—এসওএস ফোনটা কোথায়?

—ওটা স্যর, রেসকিউ টিম হসপিটালে জমা দিয়েছে।

—ওকে।

মামা ফুলদানিটা নামিয়ে নিয়েছেন। ফুলগুলো টেনে বের করছেন। কিছু পেয়েছেন নাকি?

স্টিকগুলো বের করতেই 'ঠং' করে শব্দ হল। মামা ফ্লাওয়ার ভাসটা উলটে দিলেন বিছানার ওপর।

আরেকটা সেল ফোন! মোটা, চ্যাপটা। পুরোনো মডেলের। চল্‌টা উঠে গেছে।

মামা হাতে তুলে নিয়েছেন। মাথার কাছে চাপ দিয়ে চালু করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ব্যাটারিতে চার্জ নেই।

—এটা বাতিল ফোন।

—হুঁ। কিন্তু ফুলদানিতে কেন?...ড্যানিয়েল, এই মডেলটা আমাদের খুব চেনা।

বলতে-বলতে প্রফেসর দেবের চালু ফোনটা তুলে নিয়েছেন, দুটোই এক কোম্পানির। দ্যাখো তো, বাড়িতে চার্জার পাও কিনা। থাকা উচিত।

দেবব্রত বিশ্বাস গেয়ে চলেছেন, '...সকালবেলায় চেয়ে দেখি...দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কী...'

দিন স্যর।—অফিসার কোন ঘর থেকে ঠিক নিয়ে এসেছেন

চার্জার। বললেন, চার্জে দিয়ে দিচ্ছি।

মামার হাতে চালু ফোনটা। আমরা ড্রইংরুমে সোফায় এসে বসেছি। পাশেই প্লাগ-পয়েন্ট। ল্যাপটপের কানেকশন খুলে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—আমায় দাও। অন্ করি।

'অন' করলেন। ব্যাটারির দাগগুলো টুকটুক করে উঠছে-নামছে। চার্জ হচ্ছে। কিন্তু কোনও সিগ্‌ন্যাল নেই।

মামা টেপাটেপি করছেন। সিগন্যাল আসছে না। স্ক্রিনে কোনও মোবাইল নেটওয়ার্কের নাম দুটো ফুটে উঠছে না।

—বললাম না, বাতিল ফোন।

—দুর বোকা! ভিতরে 'সিম' না থাকলে শো করত, 'ইনসার্ট সিমকার্ড'। ড্যানিয়েল, ফোনটা খুলে দেখো তো, কোন কোম্পানির সিম। নাম্বারটাও লেখা থাকবে।

ফোন 'অফ' করে 'সিম' কার্ডটা বের করা হল। ড্যানিয়েল চোখ কুঁচকে বলল, 'টি অ্যান্ড টি' নেটওয়ার্ক। নাম্বার হচ্ছে...ওঃ। এত ছোট লেটারে ছাপা!

—ওয়ান সেক্ স্যর।

—আমায় বলতে হবে না। তুমি ওদের কাস্টমার কেয়ারে ফোন করো। জিগ্যেস করো, এই নাম্বারের মালিক কে। তার ডিটেলস চাই। পরিচয় দিয়ে বলো, লক্‌টা খোলা যাবে কিনা। নিশ্চয়ই ওদের ফোন করে লক্ করে দিয়েছে।

ড্যানিয়েল সিমটা নিয়ে ব্যালকনির কাছে গেল। আজও আকাশ মেঘে-মেঘে কালো! নিজের সেল থেকে ফোন করছে।

মামা ড্যানিয়েলের অ্যাসিস্ট্যান্টকে বললেন, তোমার মোবাইল থেকে সিমটা খুলে এতে ঢুকিয়ে দাও।

বিনা বাক্যব্যয়ে অফিসার নিজের ফোন বন্ধ করলেন। তারপর পিছন থেকে সিমকার্ড বের করলেন। সেই 'সিম' টি গুঁজে দিলেন এই ফোনটাতে।

ড্যানিয়েল ঘরে ঢুকল।

—স্যর! এই নাম্বারের মালিক 'লিজা রে'। অ্যাড্রেস, ওয়ান থার্টি

এইট নিউ ইংল্যান্ড রোড, ঊরস্টার। ফোনে কোনও ব্যালেন্স নেই। সানডে ওদের ফোন করে বলা হয়েছে, মোবাইল ফোনটি হারিয়ে গেছে। তাই নাম্বারটা ইমিডিয়েট লক করে দিতে।

জগুমামা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, প্রথমেই কোনও ব্যাপারে প্রিকনসিভ্ড ধারণা করতে নেই। ফোনটা যে বাতিল নয়, বুঝলি তো!...ড্যানিয়েল, তুমি পুলিশকে বলো লিজা রে-কে ট্রেস করতে। ওকে ধরলেই সব কাহিনি বেরিয়ে আসবে। মনে হচ্ছে, শেষ চ্যাপ্টারে এসে গেছি।

—শেষ চ্যাপ্টার?

—হ্যাঁ। প্রাণতোষের হার্ট অ্যাটাকের কারণ। দ্যাট মিন্‌স গভীর রাতে অশরীরীর আবির্ভাব। এক কাজ কর। অনন্তবাবু সেই তখন থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। বৃষ্টি নামল বলে। এদেশে জ্বরজারি হলে রক্ষে নেই। সোজা অ্যাডমিট করিয়ে দেবে হাসপাতালে। এমনিতেই সোয়াইন-ফ্লুর প্যানিক আছে। বুড়োকে আমার কথা বলে ভেতরে ডাক।

অনন্ত সরখেল ভয়ার্তদৃষ্টিতে চতুর্দিক দেখতে-দেখতে সোফায় এসে বসলেন। ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

—কী অনন্তবাবু, ভূতের ডাক শুনবেন?

—না-না স্যার! স্যার, সত্যি বলছি আমার হার্ট...

—আরে মশাই, আমরা তো আছি। আর তেনারা হচ্ছেন শরীরহীন। ভয় দেখাতে পারেন, আর কিছু পারেন না।...ড্যানিয়েল!

—স্যর।

—বলেছ?

—ইয়েস স্যর।

—এবার একটা কাজ করো। তোমার ফোন থেকে তোমার এই কলিগের নাম্বারে একটা ফোন করো।

ড্যানিয়েল হতবুদ্ধির মতো চেয়ে আছে। মামার হাতে চার্জার গোঁজা অবস্থায় 'বাতিল' ফোনটা।

—বুঝলে না? তুমি ওর নাম্বারে ফোন করলেই এখন এই ফোনটা

বেজে উঠবে। করো-করো।

কয়েক সেকেন্ড! তারপরেই শিউরে উঠলাম।

ফোনে নীল আলো জ্বলে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে বেজে উঠল খোলা-ভাঙাগলায় বিকৃত ডাক, 'কাম...কাম...প্র্যান্‌টোস...কাম...কাম!'

একটু থামছে! আবার ডাকছে। নীল আলো দপ্‌দপ্‌ করে নাচছে।

বারপাঁচেক বাজল। একমিনিট হতেই কেটে গেল।

—করো! আবার করো! সে রাতে যেমন হয়েছিল।

বাইরে আকাশ ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নামছে। ঘরের ভিতরে অন্ধকার।

মামার হাতে ধরা ফোন থেকে বিচ্ছুরিত নীল আলো সিলিং-এ ভুতুড়ে ছায়া নাচাচ্ছে। সেইসঙ্গে ভূতের বিকৃত ডাক বেজে যাচ্ছে, '...কাম...প্র্যানটোস ...কাম!...'

অনন্ত সরখেল আমার হাত চেপে ধরেছেন।

—কী হল? এখনও ভয় পাচ্ছেন? বুঝেছেন, কী চমৎকার ফন্দি আঁটা হয়েছিল। প্রাণতোষকে শেষ করে দিতে?

—ও-ও-ফ্‌! রিংটোনে ভূতের ডাক! কী ভয়ানক।।

—কীভাবে করেছিল, জানেন? কোনও হাস্কি মানে খসখসে-কণ্ঠী মহিলাকে দিয়ে কথাগুলো বলিয়ে ভয়েস রেকর্ডারে রেকর্ড করিয়েছে। তারপর কম্পিউটারে ঢুকিয়ে স্পিড কমিয়ে দিয়েছে। ধরুন, আগের কালের সেভেনটিএইট লং প্লেইং বাজাচ্ছেন থার্টি থ্রি স্পিডে! কেমন হত? ভাঙা-ভাঙা কাতরে-কাতরে গান বাজত। গলা বিকৃত হয়ে যেত। ঠিক সেই পদ্ধতি।

—মামা, প্রাণতোষবাবুর যে ভূতের ভয় আছে, একথাটা ওঁর বড়রা ছাড়া কেউ তো জানে না!

—কেন জানবে না? দিদি-জামাইবাবু যখন এসেছিলেন, তাঁরা এই বাড়িতে বসেই ওর ভূতের ভয় নিয়ে মজা করে গেছেন। সেই আসরে আর কে ছিল, বল? যে জেনেছে এবং ওকে সরিয়ে দেওয়ার ফন্দি এঁটেছে?

—তুমি কি—

—হ্যাঁ। পিনাকী। ওর একমাত্র ভাইপো। প্রাণতোষ কয়েকমাস আগে

উইল করে। ফোন করে আমায় জানায়। সেই নিয়ে অনেক হাসাহাসি হল। উইলে একমাত্র লিগ্যাল হিয়ার পিনাকী দেব। পিনাকীকে নিশ্চয়হ কথায়-কথায় প্রাণতোষ এটা জানিয়েছিল। তারপর থেকেই পিনাকীর মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। কাকার এত বিরাট সম্পত্তি! তাছাড়া—

—তাছাড়া?

—তাছাড়া প্রাণতোষ সর্বশেষ যে রিসার্চ করছিল, গরু এবং মৌমাছির জিনের সংমিশ্রণ, সেই রিসার্চের ভবিষ্যৎ নিয়ে জনের মতো পিনাকীরও গভীর অবিশ্বাস ছিল। ধরে নিয়েছিল, এই জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং অসম্ভব। কিন্তু কাকাকে ও যতটুকু চেনে, জানে কাকা হাল ছাড়বেন না। য়ুনিভার্সিটি গ্র্যান্ট বন্ধ হয়ে গেলেও নিজের খরচে চালিয়ে যাবেন। অর্থাৎ যে সম্পত্তি তিলে-তিলে পাহাড় হয়েছে, কমতে শুরু করবে। তার আগেই যদি কাকাকে সরিয়ে দেওয়া যায়, সবদিক দিয়েই ওর পক্ষে মঙ্গল। পায়ের ওপর পা তুলে বসে খেলেও সুদের টাকাতে আজীবন আরামে চলে যাবে। প্রতিবছর রয়্যালটিও আসবে।

—মামা, আমার মনে হয় পিনাকী কোনও খারাপ সংসর্গে পড়েছে। হয়তো ওর ইয়ারদোস্তরা বুদ্ধি দিয়েছে।

—হতে পারে। লিজা রে-কে পুলিশ জেরা করলে সব বেরিয়ে আসবে। অবশ্য সে মেয়েটি যে খারাপ, এখনই বলা যাবে না। পিনাকী হয়তো তাকে বলেছে, ওর কোনও বন্ধু বেড়াতে এসেছে দেশ থেকে। যদি একস্ট্রা 'সিম' থাকে, কয়েকদিনের জন্য দিতে। এরকম আমরাও করি হরবখ্‌ত। টেমপোরারি 'সিম' অনেকসময়েই পরিচিতজনকে দিই।

ড্যানিয়েলের ফোনটা এইসময় বেজে উঠল।

—হ্যালো।...ইয়েস।...গুড।...অ্যারেস্ট হার অ্যান্ড ব্রিঙ হার হিয়ার। ইয়েস। নোট ডাউন দিস অ্যাড্রেস।...

ফোন ছেড়ে দিয়ে বলল, স্যর। লিজাকে পুলিশ ধরে ফেলেছে। এখানে নিয়ে আসতে বললাম।...স্যর, আপনি ডিটেকটিভ না সায়েন্টিস্ট, আমি সত্যি বলছি, জাস্ট কনফিউজ্‌ড! একটা কথা স্যর, পিনাকী যে এই প্ল্যান করেছিল, আপনি সিওর হলেন কী করে?

এই দ্যাখো।—জগুমামা হেসে প্রাণতোষবাবুর মোবাইলটা বাড়িয়ে

ধরলেন। বললেন, এতে রবিবার ভোর চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে পিনাকী নিজের ফোন থেকে চারবার ফোন করেছিল। চারবারই বেজে-বেজে কেটে যায়। নো রিপ্লাই। ওই ভোররাতে কেন করবে? করেছিল এটা জানতে যে, কাকা 'উপরে চলে গেছে' কি না। নট আনসার হওয়ায় নিশ্চিত হয়ে যায়, কাকা শেষ। তখন ও ওয়েট করছিল, আশেপাশের প্রতিবেশিরা কখন খবরটা দেয়। কিন্তু ওর লাক খারাপ। সেন্ট ভিনসেন্ট হসপিটাল থেকে আটটায় খবর আসে প্রাণতোষ অ্যাডমিটেড। বেঁচে আছে। তখনই নিশ্চয়ই লিজাকে জানায়, ফোনটা হারিয়ে গেছে। নাম্বার লক করে দিতে।

—কিন্তু মামা, এতে ধরা পড়ার চান্সগুলো কিন্তু ছিল।

—প্রাণতোষ মারা গেলে কিছুই থাকত না। হার্ট অ্যাটাকে যে-কোনও মানুষ মারা যেতে পারে। আর আমরা আসছি, ও জানে। সাক্ষীও থাকত। দেশেও কেউ প্রাণতোষের মৃত্যু নিয়ে কোনও সন্দেহ করত না। যা করেছে, ভেবেচিন্তে করেছে।

স্যর।—ড্যানিয়েল বলল, তাহলে পিনাকীকে অ্যারেস্ট করি?

—একটু দাঁড়াও। প্রাণতোষের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই। ওর একমাত্র ভাইপো। দু-চারদিন যাক্। ওয়েট অ্যান্ড সি। ওর ওপর নজর রাকো। এদেশ থেকে পালিয়ে যাবে কোথায়?

বাইরে অঝোরধারায় বৃষ্টি পড়ছে। ঘরের মধ্যে হঠাৎ পিন্‌পড়া নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। সবাই চুপ।

শোওয়ার ঘরের সাউন্ড সিস্টেম থেকে একের পর এক ভেসে আসছেন রবীন্দ্রনাথ, '...মেঘ বলেছে যাব যাব...রাত বলেছে যাই...সাগর বলে কূল মিলেছে—আমি তো আর নাই...।'

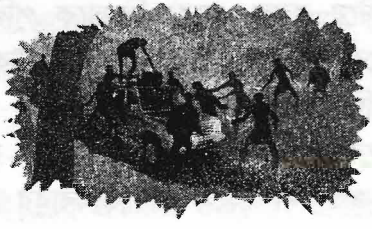

অন্ধকার ভালো...নয়

তুই ধরছিস না। ফোনটা ধরতে বলল।'

বাবা ফোন ছেড়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে আবার মোবাইল ব্লিঙ্ক করতে শুরু করেছে। সেই নাম্বারহীন কল।

'হ্যালো, টুকলু?'

'হ্যাঁ। তুমি!'

'যাক্, শেষ পর্যন্ত ধরেছিস। জামাইবাবু বলছিল, রবীন্দ্রসদনে ফাংশনে ঢুকে আছিস।'

'হ্যাঁ। গান চলছিল। বলো, হঠাৎ কী ব্যাপার? তুমি এখন কোত্থেকে?'

'এখনও পর্যন্ত দিল্লিতে। তবে পরশু যেতে হচ্ছে রবি ঠাকুরের দেশে।'

'রবীন্দ্রনাথের দেশে? মানে শান্তিনিকেতনে আসছ?'

'দূ-র! সে তো ওনার প্রতিষ্ঠানের জায়গা। যেখানে যাচ্ছি, সেখানে উনি সশরীরে যেতে পারেননি হয়তো, কিন্তু কল্পনায় কতবার যে গেছেন! কত গান যে লিখেছেন সে দেশকে নিয়ে। হয়তো না জেনেই।'

'যা ব্বাবা! কী হেঁয়ালি শুরু করলে!'

'শোন্, ওনার এইট্টি পার্সেন্ট পূজা-প্রকৃতি পর্যায়ের গানে সেই দেশের ছবি পাবি। যেমন, ওই যে 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে'র 'মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগনমাঝে, বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে...।' বা ওই গানটা রে! ওই যে 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি' গানে 'বনে বনে ওড়ে তোমার রঙিন বসনপ্রান্ত।'

'কী ব্যাপার বলো তো মামা? বেশ মুডে আছ মনে হচ্ছে।'

'ঠিক বলেছিস? সারা পৃথিবী ঘুরেছি, কিন্তু আমাদের দেশের সবচেয়ে সুন্দর জায়গাতেই আমার কখনও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথ না এসেই লিখে ফেললেন ওই গানটা, 'আমার নয়নভুলানো এলে।' তারপর লিখলেন, 'অরুণ আলোর আঁচলখানি লুটিয়ে পড়ে বনে।' ঠিক বলছি তো?

'না। একটু গুলিয়ে গেছে! ওঃ, এনাফ হয়েছে মামা। এবার ঠিকঠাক বলো তো, কোথায় যাচ্ছ?'

'তুই বল্ না, কোথায় যাচ্ছি?'

'আমি? আমি বলব কী করে?'

'ক্লু দিলাম যে। অরুণ আলোর আঁচলখানি...'

'অরুণাচল?'

'রাইট! আশঙ্কা করছিলাম, দিনরাত অ্যাম্পিয়ার, ভোল্টেজ করে-করে তোর বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে! বাঁচালি! বলছি, তুই কি যেতে পারবি আমার সঙ্গে?'

'অরুণাচলে? তোমার সঙ্গে? কীভাবে যাব?'

'সেটা আমার দায়িত্ব। আমি পরশু সকালে দিল্লি থেকে স্ট্রেট গৌহাটি পৌঁছচ্ছি। তোরা কলকাতা থেকে মর্নিং ফ্লাইট ধরে আসবি। এয়ারপোর্টে মিট করে একসঙ্গে অরুণাচলের দিকে রওনা হব।'

বুকের মধ্যে ধপ্-ধপ্ শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

'তোরা মানে?'

'মানে তুই আর অনন্ত সরখেল। এত সুন্দর জায়গা, খ্যাপা বন্ধুকে তো আর ফেলে আসা যায় না। ইন ফ্যাক্ট, নেটে তোদের দুজনের এয়ারটিকিটও বুক করে রেখেছি। এখন অফিসকে ম্যানেজ করে তুমি যদি আসতে পারো! নইলে ক্যানসেল করে দেব।'

অফিস? অফিসে যেভাবেই হোক, ম্যানেজ করে নেব। মামার সঙ্গে অরুণাচল বেড়ানোর এরকম সুযোগ কি আর কখনও আসবে?

'অনন্তবাবুকে বলেছ?'

'ক-খ-ন! তোকে না পেয়ে তাকেই তো একটু আগে ধরলাম। বুড়ো নাচতে লেগেছে।...'

মনে-মনে আমারও তো একই দশা।

'মামা, অফিসের ব্যাপারটা মনে হয় পেরে যাব। বেশ কয়েকটা ছুটি পাওনা আছে। একটা কথা স্ট্রেট বলবে! আমরা কি স্রেফ বেড়াতে যাচ্ছি অরুণাচলে?'

'সে কি কখনও হয়েছে রে? আমাদের বেশিরভাগ যাত্রা এরকম হঠাৎ-হঠাৎ হয়েছে। রথ দেখা আর কলা বেচা।'

'রথ দেখা বুঝলাম। কলা বেচাটা কী?'

'বলছি। আজ সকালে য়ুনিভার্সিটি ল্যাবে ঢুকেছি, ঠিক দশটায়

পট্টনায়েক এসে হাজির। সে এখন ন্যাশনাল সিকিওরিটি কমিশনের চিফ অ্যাডভাইজার।'

'হুঁ।'

'বলল, অরুণাচলের তাওয়াং ফরেস্টে কিছুদিন ধরে একটা সমস্যা শুরু হয়েছে। রোজ চার-পাঁচজন করে প্ল্যান্ট কালেকটররা গায়েব হয়ে যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশজনের কোনও ট্রেস পাওয়া যায়নি।'

'প্ল্যান্ট কালেক্টর মানে? যারা গাছগাছড়া সংগ্রহ করে?'

'হ্যাঁ। শুনে অবাক হবি, শুধু তাওয়াং ফরেস্টেই এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার মেডিসিন্যাল প্ল্যান্টের সন্ধান পাওয়া গেছে। ট্রাইবাল মানুষরা রোগ-সারাতে জড়িবুটি হিসেবে এদের কাজে লাগায়। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট গত পাঁচবছর ধরে ওইসব গাছেদের মধ্যে যেগুলো রেয়ার স্পেসিমেন, অল্টারনেটিভ মেডিসিন হিসেবে সেগুলো নিয়ে রিসার্চ করাচ্ছে। লোকাল ট্রাইবদের বড় একটা গ্রুপকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে এইসব প্ল্যান্ট সংগ্রহের জন্যে। তাদের মধ্যে থেকেই নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি! রিসার্চের কাজ বন্ধ। অতএব তখন সত্যসাধন পট্টনায়েকের মনে হয়েছে, তার বন্ধু জগবন্ধু মুখার্জি যখন দিল্লিতে রয়েছে, তাকেই চেপে ধরো।'

'আর তুমি অমনি রাজি হয়ে গেলে?'

'হব না? কতদিন এরকম থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স হয়নি, ভেবে দ্যাখ! দুর্গম জঙ্গল-পর্বতে ঢাকা অরুণাচল, কতরকম উপজাতি, কতরকম বন্যজন্তু...আর নেচার! আঃ, প্রকৃতির দরজা যেখানে দু-হাট করে খোলা। তুই কি একটু ঘাবড়ে যাচ্ছিস?'

'পা-গল! তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, ভয় পাব? প্লেনের টিকিট কি মেল করে দিচ্ছ?'

'নিশ্চয়ই। আজকেই তোর মেলে পেয়ে যাবি। সঙ্গে ভোটার আই-কার্ড রাখিস। আর অনন্তবাবুকে বলবি, কাল রাতে যেন তোদের বাড়িতে থেকে যায়। নইলে ভোর পাঁচটার ফ্লাইট ধরতে পারবে না।'

'ও.কে.।'

'আর দিদি-জামাইবাবুকে সবটা বলবি না। চিন্তা করবে। বুঝলি?'

'বুঝলাম। আমরা গৌহাটি থেকে কী বাই রোড যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ। হেলিকপ্টার সার্ভিস ইরেগুলার। আবহাওয়ার জন্যে প্রায়ই ক্যানসেল হয়। আর্মির কপ্টার ছিল, কিন্তু আমিই মানা করলাম। আমাদের যাওয়ার কথা জানাজানি হয়ে যাবে।...প্রথম রাত হল্ট করব বমডিলা, পরদিন ভোরে রওনা দিয়ে দিরাং হয়ে তাওয়াং। ও.কে. ভাগ্নে, তবে ওই কথাই রইল। ডে আফটার টুমরো, উই'ল মিট অ্যাট গুয়াহাটি এয়ারপোর্ট। গুড নাইট।'

মামা ফোন ছেড়ে দিলেন। আমার শরীরের মধ্যে যেন দশঘোড়ার এঞ্জিন চালু হয়ে গেছে। দারুণ আনন্দ হচ্ছে। পরশু...এই পরশুই যাচ্ছি ভারতের শেষপ্রান্তে অরুণাচল রাজ্যে!

ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে গাড়ি উড়িয়ে বাড়ি পৌঁছলাম। কাল সকালেই অফিসে লিভ অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে।

গ্যারাজে গাড়ি ঢুকিয়ে ওপরে উঠছি, মোবাইলটা আবার বেজে উঠেছে।

'হাই! ইজ দিস অর্ণব ভট্টাচার্য?'

'ইয়েস। হু'জ কলিং?'

'ফ্রম সিকিওরিটি কমিশন, জাস্ট টু ভেরিফাই য়োর নাম্বার...ও. কে., বাই।'

ফোনের এস. টি. কোড দিল্লির নয়। সম্ভবত অসম বা অরুণাচলের।

২

'সার, বাত কিজিয়ে।'

মদন ফোনটা জগুমামাকে দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। ওর হাতে পারমিটের একগোছা কাগজ।

'হ্যালো...ইয়েস, স্পিকিং।...নো নো, উই আর ফাইন।...ইয়েস,

বমডিলা।...নো প্রবলেম। আই'ল কল য়ু।...বাই।'

মামা মদনের ফোনটা ড্যাশবোর্ডে রাখলেন। সুমো স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। ভালুকপং চেক পোস্ট পেরিয়ে আমরা ঢুকে পড়েছি অরুণাচলে।

সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেছে দুদিকের দৃশ্যপট। ঢেউ-খেলা ঘন সবুজ পাহাড়ের মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। গাড়ি ওপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে।

'ডক্টর কর্মা শেরিং ফোন করেছিল। প্রোফেসর নরবুর নাম্বার ওয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট। বলল, এখান থেকে বমডিলা আপ-হিলে আরও ঘণ্টাপাঁচেক লাগবে। তাই জিগ্যেস করল, বমডিলাতে হল্ট করব, নাকি আরও এগোব। হোটেলে জানিয়ে রাখবে।'

'তুমি বমডিলাই কনফার্ম করলে তো?'

'ন্যাচারালি। কিন্তু কর্মা...? একমিনিট! এই ফোনেই তো...নাহ্! ল্যান্ড নাম্বার থেকে করেছে।'

'এনিথিং রং মামা?'

'না, কিছু না।'

ডানদিকে একটা চাপা গর্জন শোনা গেল। স্রোতের শব্দ। বিশাল চওড়া একটা নদী দুপাশে সবুজ পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ঝাঁপিয়ে নেমেছে সমতলে। টলটলে কাকচক্ষু জল। নীচের নুড়িপাথর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

'মদন, ইয়ে নদী কি কেয়া নাম হ্যায়?'

'সাব, ভারালি। উপরমে যাকর ইসকী নাম হোগা কামেং।'

'ঠিক, ঠিক। জিয়াভরলি। আসামে ঢুকে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে। এই নদীকে নিয়ে সুবোধ ঘোষের একটা বিখ্যাত উপন্যাস আছে।'

'আঃ, কী অপূর্ব সব নাম স্যার।' অনন্ত সরখেল উচ্ছ্বসিতভাবে বললেন, 'আগে ছিলুম ভালুকপং, অনেকটা যেন কিং কং। এবার জিয়াভরলি, তুই আমাদের মন ভরালি।'

'অ্যাঁ! কবিতা? কবিতা বানাচ্ছেন নাকি মশাই?'

'বানাতে হচ্ছে না স্যার। আপনা-আপনি এসে যাচ্ছে। চেকপোস্টে দাঁড়িয়ে ভালুকপংটা এল। কিংকং-এর পর আর এগোতে পারলুম না।'

'হঠাৎ কিংকং কেন?'

'কেন, কী করে বলি স্যার? বোধহয় সিনেমাটায় কিংকংকে ভালুকের মতো দেখতে ছিল, তাই।'

'কোথায় ভালুকের মতো? গোরিলার আদলে তাকে মডেল বানানো হয়েছিল।...তবে অনন্তবাবু, এদেশ দেখতে যেমন সুন্দর, তেমন ভয়ঙ্করও।'

'ভয়ঙ্কর! কেন স্যার?'

'এখানকার জঙ্গলে অজস্র হিংস্র জন্তু। হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার প্রচুর। শুধু ভালুক কেন, লেপার্ড, বুনো হাতি, শুয়োর, বুনো মোষ, বুনো বেড়াল...সবই হিংস্র এবং অঢেল। এমনকী বমডিলার রাস্তায় ভূতও দেখতে পেতে পারেন।'

'ভ্-ভূত!'

'হ্যাঁ অনন্তবাবু। এই এলাকাতে অরুণাচলীরা 'আকা' উপজাতির। ভদ্র, সভ্য। এর পর 'মনপা' উপজাতিদের অঞ্চল শুরু হবে। মনপাদের আবার নানা গোষ্ঠী। তাদের একটার নাম 'ভূত'। ভূত-প্রেত নিয়ে চর্চা করে। দেখতেও হয়তো ভূতের মতো।'

'অ। তাই বলুন স্যার। জলজ্যান্ত মানুষ।' অনন্তবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, 'শরীর থাকলে আমার কোনও ভয় নেই। কী বলো টুকলু?'

অনন্ত সরখেলের দিকে তাকিয়ে হাসলুম। বললাম, 'ভালুকপং-এ কি একসময় ভালুকদের উৎপাত ছিল?'

'জানি না। তবে পুরাণে নাকি আছে, এই অঞ্চলে অসুররাজ বাণের নাতি ভালুক রাজত্ব করতেন। তোরা খেয়াল করিসনি, একটা ভাঙাচোরা দুর্গও আছে। আকা ট্রাইবরা বলে, ওরা ভালুক রাজার বংশধর।'

গাড়ি গর্জন করে পাহাড়ি পাকদণ্ডী বেয়ে ওপরে উঠছে। একদিকে খাদ, অন্যদিকে হিমালয়। গোধূলি-বিকেলের কমলা ছায়া পড়েছে সবুজের গায়ে। মেঘে-মেঘেও সেই রং।...

আজ আমাদের দিন শুরু হয়েছে ভোরের আলো ফোটার আগেই। সাড়ে সাতটায় গুয়াহাটি এয়ারপোর্টে যখন পুঁচকে এ. টি. আর বিমান নেমেছিল, তাতে গুটিকয় মাত্র প্যাসেঞ্জার। আমরা মুখ-হাত ধুয়ে

বমডিলা।...নো প্রবলেম। আই'ল কল য়ু।...বাই।'

মামা মদনের ফোনটা ড্যাশবোর্ডে রাখলেন। সুমো স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। ভালুকপং চেক পোস্ট পেরিয়ে আমরা ঢুকে পড়েছি অরুণাচলে।

সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেছে দুদিকের দৃশ্যপট। ঢেউ-খেলা ঘন সবুজ পাহাড়ের মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। গাড়ি ওপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে।

'ডক্টর কর্মা শেরিং ফোন করেছিল। প্রোফেসর নরবুর নাম্বার ওয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট। বলল, এখান থেকে বমডিলা আপ-হিলে আরও ঘণ্টাপাঁচেক লাগবে। তাই জিগ্যেস করল, বমডিলাতে হল্ট করব, নাকি আরও এগোব। হোটেলে জানিয়ে রাখবে।'

'তুমি বমডিলাই কনফার্ম করলে তো?'

'ন্যাচারালি। কিন্তু কর্মা...? একমিনিট! এই ফোনেই তো...নাহ্! ল্যান্ড নাম্বার থেকে করেছে।'

'এনিথিং রং মামা?'

'না, কিছু না।'

ডানদিকে একটা চাপা গর্জন শোনা গেল। স্রোতের শব্দ। বিশাল চওড়া একটা নদী দুপাশে সবুজ পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ঝাঁপিয়ে নেমেছে সমতলে। টলটলে কাকচক্ষু জল। নীচের নুড়িপাথর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

'মদন, ইয়ে নদী কি কেয়া নাম হ্যায়?'

'সাব, ভারালি। উপরমে যাকর ইসকী নাম হোগা কামেং।'

'ঠিক, ঠিক। জিয়াভরলি। আসামে ঢুকে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে। এই নদীকে নিয়ে সুবোধ ঘোষের একটা বিখ্যাত উপন্যাস আছে।'

'আঃ, কী অপূর্ব সব নাম স্যার।' অনন্ত সরখেল উচ্ছ্বসিতভাবে বললেন, 'আগে ছিলুম ভালুকপং, অনেকটা যেন কিং কং। এবার জিয়াভরলি, তুই আমাদের মন ভরালি।'

'অ্যাঁ! কবিতা? কবিতা বানাচ্ছেন নাকি মশাই?'

'বানাতে হচ্ছে না স্যার। আপনা-আপনি এসে যাচ্ছে। চেকপোস্টে দাঁড়িয়ে ভালুকপংটা এল। কিংকং-এর পর আর এগোতে পারলুম না।'

'হঠাৎ কিংকং কেন?'

'কেন, কী করে বলি স্যার? বোধহয় সিনেমাটায় কিংকংকে ভালুকের মতো দেখতে ছিল, তাই।'

'কোথায় ভালুকের মতো? গোরিলার আদলে তাকে মডেল বানানো হয়েছিল।...তবে অনন্তবাবু, এদেশ দেখতে যেমন সুন্দর, তেমন ভয়ঙ্করও।'

'ভয়ঙ্কর! কেন স্যার?'

'এখানকার জঙ্গলে অজস্র হিংস্র জন্তু। হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার প্রচুর। শুধু ভালুক কেন, লেপার্ড, বুনো হাতি, শুয়োর, বুনো মোষ, বুনো বেড়াল...সবই হিংস্র এবং অঢেল। এমনকী বমডিলার রাস্তায় ভূতও দেখতে পেতে পারেন।'

'ভ্-ভূত!'

'হ্যাঁ অনন্তবাবু। এই এলাকাতে অরুণাচলীরা 'আকা' উপজাতির। ভদ্র, সভ্য। এর পর 'মনপা' উপজাতিদের অঞ্চল শুরু হবে। মনপাদের আবার নানা গোষ্ঠী। তাদের একটার নাম 'ভূত'। ভূত-প্রেত নিয়ে চর্চা করে। দেখতেও হয়তো ভূতের মতো।'

'অ। তাই বলুন স্যার। জলজ্যান্ত মানুষ।' অনন্তবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, 'শরীর থাকলে আমার কোনও ভয় নেই। কী বলো টুকলু?'

অনন্ত সরখেলের দিকে তাকিয়ে হাসলুম। বললাম, 'ভালুকপং-এ কি একসময় ভালুকদের উৎপাত ছিল?'

'জানি না। তবে পুরাণে নাকি আছে, এই অঞ্চলে অসুররাজ বাণের নাতি ভালুক রাজত্ব করতেন। তোরা খেয়াল করিসনি, একটা ভাঙাচোরা দুর্গও আছে। আকা ট্রাইবরা বলে, ওরা ভালুক রাজার বংশধর।'

গাড়ি গর্জন করে পাহাড়ি পাকদণ্ডী বেয়ে ওপরে উঠছে। একদিকে খাদ, অন্যদিকে হিমালয়। গোধূলি-বিকেলের কমলা ছায়া পড়েছে সবুজের গায়ে। মেঘে-মেঘেও সেই রং।...

আজ আমাদের দিন শুরু হয়েছে ভোরের আলো ফোটার আগেই। সাড়ে সাতটায় গুয়াহাটি এয়ারপোর্টে যখন পুঁচকে এ. টি. আর বিমান নেমেছিল, তাতে গুটিকয় মাত্র প্যাসেঞ্জার। আমরা মুখ-হাত ধুয়ে

শারীরিক কাজকর্ম সেরে নিই।

দিল্লির বড় এয়ারবাস এল সকাল ন'টায়। মামা এসেই বললেন, 'চল। ড্রাইভার নিশ্চয়ই গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। তোর কাছে তো তার মোবাইল নম্বর আর গাড়ির নম্বর পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ। সিকিওরিটি কমিশন থেকে কালকে কম্প্যুটার জেনারেটেড এস.এম.এস পাঠিয়ে দিয়েছে। পরশু রাতে বোধহয় এদিককার কোনও নাম্বার থেকে একজন ফোন করে আমার নাম্বার ভেরিফাই করে নিয়েছিল।'

'তাই?' মামা একটু থমকে গেছিলেন, 'মেবি। গাড়িটা আসার কথা অরুণাচল থেকে। ওদের নেটওয়ার্ক ভেরি স্ট্রং।'

তারপর একটু গম্ভীরভাবে বলেছেন, 'তোকে পরশু সবটা বলিনি। হঠাৎ প্ল্যান্ট কালেকটররা গায়েব হবে কেন? নিশ্চয়ই কোনও শত্রু তৈরি হয়েছে। হবে কেন? তার কারণ হল, প্রোফেসর থুপতেন নরবুর গবেষণা। নরবু এখন ভারতের অন্যতম শীর্ষ উদ্ভিদবিজ্ঞানী। তাওয়াং-এর একটা ল্যাবরেটরিতে পার্টিকুলারলি এথনো-মেডিসিন্যাল প্ল্যান্ট নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে টানা রিসার্চ করে যাচ্ছিলেন।'

'তারপর?'

'ভালুকপং পর্যন্ত প্রায় দশঘণ্টার জার্নি। যেতে-যেতে বলব।'

এয়ারপোর্টের বাইরে মদন তামাং প্লাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফোন মেলাতে হয়নি। শুধু ওঠার আগে সুমোর নম্বরটা মিলিয়ে নিয়েছিলাম।

পথে রাঙ্গাপাড়ায় টাটকা মাগুর মাছের ঝোল-ভাত দিয়ে লাঞ্চ সেরে নিয়েছি। তারপর থেকে একটানা ন্যাশনাল হাইওয়ে-৩৭ ধরে চলেছি।

চলতে-চলতে মামা সকালের পুরোনো কথায় ফিরে এসেছিলেন, 'প্রোফেসর থুপতেন নরবু এই অঞ্চলের মানুষ। সান অব দ্য সয়েল। পট্টনায়েক বলেছে, উনি মনপা ট্রাইব। তাই গবেষণা করার সময়ে লোকাল ট্রাইবদের সাপোর্ট পেয়েছেন। আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এই ক'বছর ধরে জলের মতো টাকা দিয়েছে। কারণ সরকারের পলিসিই হল, নর্থ-ইস্টের যে-কোনও রিসার্চ-প্রজেক্টকে সাহায্য করা। নরবু এই

কাজে লোকাল প্ল্যান্ট কালেকটরদের দুর্গম পাহাড়ি-জঙ্গলে পাঠিয়েছেন। নিজেও গেছেন ইনটিরিয়র গ্রামে। ট্রাইবালদের কাছ থেকে নতুন-নতুন গাছ পেয়েছেন। তাদের উপকারিতা জেনেছেন। স্তম্ভিত হয়ে গেছেন।'

'স্তম্ভিত হয়েছেন! কেন?'

'হবেন না? নরবু দেখেছেন, এমন-এমন গাছ অরুণাচলের জঙ্গলে আছে, যাদের কথা কেউ জানে না। কোনও গাছ হয়তো চেনা। কিন্তু উপজাতি মানুষেরা তাদের এমনসব মারাত্মক অসুখ সারাবার ক্ষমতার কথা জানে, বিজ্ঞানীরাই জানেন না।'

'এদেরকেই কি এথনো-মেডিসিন্যাল প্ল্যান্ট বলে?'

'হ্যাঁ। শিবকালী ভট্টাচার্যের 'বনৌষধি'। গাছড়া। এই গাছ-গাছড়া নিয়ে যদি বিজ্ঞান-গবেষণা সফল হয়, মেডিক্যাল সায়েন্সে বিপ্লব ঘটে যাবে। টুকলু, দুঃখ কি জানিস, আমাদের দেশে যে কী হিউজ রিসোর্স আছে, আজও আমরা নিজেরা জানি না।'

'মামা, একটা কথা বলব? এই রিসার্চ করতে গিয়েই কি নরবুর সমস্যা তৈরি হল?'

'রাইট। পরশু দিন সকালে পট্টনায়েক নরবুর সঙ্গে আমায় ফোনে ধরিয়ে দিল। ওকে নামে চিনতাম। আগে কখনও আলাপ হয়নি। গলা শুনে মনে হল, প্রফেসর খুব টেন্‌সড। প্ল্যান্ট কালেকটররা জঙ্গলে ঢুকেছে। তারপর গায়েব। অথচ সকলেই ট্রাইবাল মানুষ। অনেক বেশি টাকা দিতেন। ওনার ধারণা, ওদের ভয় দেখানো হয়েছে।

'ভয় দেখানো হয়েছে! কেন?'

'আমার ধারণা। নরবুর রিসার্চের বিষয় কোনও র‍্যাকেট জানতে পেরেছে। তারা পুরোটা আত্মসাৎ করতে চায়।'

'ওনার স্পেসিফিক রিসার্চ কী জেনেছ?'

'জেনেছি। উনি একটা গাছের সন্ধান পান। তার অ্যালকালয়েড একসট্রাক্ট করেন। দেখেন, 'এড্‌স' রোগে আশ্চর্য কাজ করার ক্ষমতা আছে ওই পার্টিকুলার স্পিসিসের।'

'বলো কী! গাছটা কী?'

'না। ফোনে আর কিছু বলেননি। বললেন, গেলে সামনাসামনি কথা

হবে।'...

ভালুকপং-এর পর ছোট-ছোট গ্রাম। কিলং...উমবাম... মিরিং...। এখন আর কোনও জনপদ নেই। একদিকে জঙ্গল-পাহাড় আর অন্য দিকে খাদ। সুমো উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে। কখনও-কখনও ওপাশ দিয়ে ছোট গাড়ি, বড় গাড়ি, বাস নামছে। মানুষজন নেই।

আলো ক্রমেই মরে আসছে। দ্রুত অন্ধকার জমছে। দূরের পাহাড়গুলো কুয়াশার ঘন চাদরে ঢেকে গেছে। আশপাশে ছায়া-ছায়া ঘনিয়ে আসছে। কিচমিচ করতে-করতে ঝাঁক-ঝাঁক পাখি ঢুকে পড়ছে গাছে।

মদন অনেকক্ষণ হল হেডলাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে। অনেক দূর পর্যন্ত অন্ধকার ফুঁড়ে দিচ্ছে আলো।

দ্রুতবেগে কোনও একটা জন্তু বাঁদিকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ছুটতে-ছুটতে খাদের দিকে নেমে গেল।

'মদনজি, কেয়া থা উও জানবর?' জিগ্যেস করলাম।

'শায়দ লেপার্ড হোগা। ইধর বহোত হ্যায়।'

'ল্-লে-পার্ড! চিতাবাঘ?' অনন্ত সরখেল কোঁত করে উঠলেন।

'হাঁ সাব।' মদন বলল, 'স্রিফ লেপার্ড কেয়া, হর কিসিমকা জানবর হ্যায়। বহোৎ ভালু হ্যায়, খতরনাক সব বিল্লি হ্যায়। কিসি-টাইম সড়ক কে উপ্পর হাস্থি ভি আ যাতা হ্যায়।'

অনন্তবাবু চুপ। মামা বললেন, 'কী মশাই, আর কবিতা-টবিতা আসছে না?'

'স্-স্যর, এই এলাকায় জনমনিষ্যি একেবারে নেই?'

'হয়তো আছে। ট্রাইবালরা। অনেক দূর-দূর গ্রামে। এরাজ্যে এখনও জনবসতি ভারতের অন্য রাজ্যের চেয়ে অনেক কম। আবার কি জানেন, এইসব ট্রাইবালদের মধ্যে আদিম হেড-হান্টারস মানে নরমুণ্ড-শিকারিও আছে।'

'স্যার, শুধুমুদু ভয় দেখাবেন না।'

'আরে, ভয় দেখাব কেন? যা সত্যি তাই বলছি। অরুণাচলীদের মধ্যে ওয়াংচো ট্রাইবরা ভয়ানক হিংস্র। মানুষের মুণ্ডু কেটে গলায় ঝোলায়।'

'ওঁক্!'

জনহীন পাহাড়রাজ্যে এখন ঘন অন্ধকার। হেডলাইটের আলোর বৃত্তের চারপাশে ছায়া দুলছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

পিঁক করে একটা শব্দ হল আমার মোবাইলে।

'এ কী মামা! টাওয়ার চলে গেছে। কোনও সিগন্যাল নেই।'

'এটাই স্বাভাবিক। এখানে টাওয়ার বসাবে কে?'

মামা নির্লিপ্তভাবে কথাটা বললেও খচখচ করতে লাগল। মোবাইল ছাড়া আজকাল খুব অসহায় লাগে।

'তোমার সেটে আছে?'

'থাকা উচিত। দেখিনি। স্যাটেলাইট ফোন। তবে তোরটায় সিগন্যাল না থাকলে কেউ কনট্যাক্ট করতে পারবে না। আমারটা থেকে খালি করা যায়। আর্মি বা সিকিওরিটি ছাড়া কেউ আমায় কনট্যাক্ট করতে পারবে না।'

এইসময় অন্ধকার পাহাড়ের গায়ে কয়েকটা আলোর বিন্দু দেখা গেল।

পাহাড়ের মাঝে অনেকটা সমতল মতো এলাকা। ছোট জনপদ। সড়কের দুদিকে খান-কুড়ি স্টেশনারি দোকান, চায়ের ছাউনি, ভাতের হোটেল। টিনের তেরপলের ছাউনি, কাঠের-বাঁশের দরমা। টিমটিমে আলো জ্বলছে। সাইনবোর্ডে পড়লাম, 'চাকু'।

মদন গাড়ির গতি কমাল। জিগ্যেস করল, 'সাব, ইধর রুকেঙ্গে কেয়া?'

'কিঁউ?'

'চায়ে পিনা হ্যায় তো পি-লিজিয়ে সাব। ইসকে বাদ বমডিলা তক কুছ ভি নেহি মিলেগা।'

'কোই জরুরত নেহি। সিধা বমডিলা চলো। পঁহুচনে মে দের হো যায়েগা।'

মদন কথা-না-বলে গাড়ির স্পিড তুলে দিল। দেখতে-দেখতে দোকান-বাজার শেষ হয়ে গেল। খাদের কিনারে গুটিকয়েক পরপর বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। কাঁটাতারের ফেন্সিং। আর্মি বা সরকারি

অফিসারদের নিশ্চয়ই। সারি-সারি টিউবলাইট জ্বলছে। সবগুলো জ্বলছে না, দপদপ করছে। ভোল্টেজ খুব কম।

পিঁক করে আবার একটা শব্দ হল আমার মোবাইলে। সিগন্যাল এসেছে। বিএসএনএল-এর দুটোমাত্র দাগ। স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল।

আলো পেরিয়ে আবার মিশমিশে অন্ধকার। হেডলাইটের দুটো আলোর সুড়ঙ্গ কিছুদূর গিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

মোবাইলে আলো জ্বলে উঠল। বাজতে শুরু করেছে। সিগন্যালের দাগ ওঠানামা করছে। নম্বরটা অচেনা। কোড দেখে মনে হচ্ছে, এদিককার।

'হ্যালো।'

ওদিকে ঘড়ঘড় শব্দ। নিজের গলার শব্দ ফেরত এল।

'হ্যালো! হু'জ স্পিকিং?'

আবার নিজের গলা। সিগন্যাল মাত্র এক দাগ।

কিছুই শোনা গেল না। কেটে গেল। সিগন্যাল উড়ে গেছে।

'মোবাইলটা দে তো।' মামা দেখে বললেন, 'হুঁ। একই নাম্বার। বোধহয় জানতে চাইছিল, কদ্দূর এসেছি। মদনেরটায় পায়নি। তাই তোরটায় করেছে।...কিন্তু...'

'কিন্তু?'

'তোর নাম্বার...?' মামা চুপ করে গেলেন।

সুমোতে বেশ ঝাঁকুনি হচ্ছে। হেডলাইটে দেখা যাচ্ছে, রাস্তায় বড়-বড় গর্ত। খাদের দিকে স্টোনচিপস পড়ে আছে। কালো-কালো ভূতের মতো জনহীন তাঁবু, দু-তিনটে পিচ গলানোর লোহার উনুন। দিনেরবেলায় রাস্তা সারানোর কাজ হচ্ছে।

সাবধানে চালাচ্ছে মদন। তবুও খাদ-পাহাড় বাঁচিয়ে গর্ত এড়ান যাচ্ছে না। ক্যাঁচ-ক্যোঁচ শব্দ হচ্ছে। নুড়ি-পাথর ছিটকে লাগছে গাড়ির নীচে।

হঠাৎ খুব জোরে 'ঠং-ং' করে একটা শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুমোর গর্জন থেমে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে হ্যান্ড ব্রেক টানল মদন। গাড়ি পিছনদিকে গড়াতে-গড়াতে আটকে গেল।

বারবার ইগনিশন সুইচ ঘোরাচ্ছে মদন। কোনও শব্দ হচ্ছে না। শুধু আলো জ্বলছে। আমাদের গাড়ি বিকল হয়ে গেছে!

৩

'এ কী হল?' এতক্ষণে মামাকে বিচলিত দেখাল, 'এঞ্জিন একেবারে সাইলেন্ট!'

'ওহি তো সাব।' মদন বিড়বিড় করে বলল, 'সায়দ ইলেকট্রিক সার্কিটমে কুছ হুয়া।'

'তুমি সারাতে পারবে না?' দেখবে একবার?'

'কেয়া দেখেঙ্গে? ইয়েসব গাড়িমে কোম্পানি সে ইলেকট্রনিক সার্কিট লাগা দেতা হ্যায়। পসিবল নেহি হ্যায় সাব। আগার মেকানিক্যাল ছোটামোটা গড়বড় হো তো, ট্রাই কর লেতা।'

'তাহলে? এখন?' মামাকে অসহায় লাগছিল।

মদন হাতের যে ভঙ্গি দেখাল, তাতে ওর অবস্থাও আমাদের মতো।

কয়েক মুহূর্ত নৈঃশব্দ্য। বড়-বড় নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

তারপর গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল মদন।

'সাবলোগ, উতরিয়ে। পহলে গাড়ি তো সাইড করনা হোগা। সড়ককে উপর অ্যায়সে নেহি রাখ সকতে। উপর সে কোই গাড়ি আয়েগা, জরুর মার দেগা। অর জানবর ভি কুছ দের বাদ জঙ্গলসে নিকাল কে সড়ক পর আয়েগা। হাস্থি দেখেগা তো উলট দেগা!'

'ন্-নীচে নামতে হবে? ভ্-ভালুক...লেপার্ড...!' অনন্তবাবু কঁকিয়ে উঠলেন।

'হ্যাঁ। কবিতা বেরোচ্ছে এতক্ষণে!' মামা বললেন, 'আমার সঙ্গে রিভলবার আছে। আসুন তো!'

বাইরে প্রবল ঠান্ডা। জ্যাকেট-টুপি পরে নিয়েছি। তারপর চড়াই রাস্তায় সুমোকে তিনজনে প্রাণপণে ঠেলছি। মদন চালকের সামনে।

কী প্রচণ্ড পরিশ্রম। ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে। একটু উঠছে। আলগা

দিলেই পিছনে গড়াচ্ছে।

প্রায় দশ মিনিটের চেষ্টায় সুমোকে খাদের ধারে দাঁড় করানো গেল। অনন্তবাবু চট করে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

আকাশে চাঁদ নেই। কৃষ্ণপক্ষের শেষ। ঘোর অমাবস্যা। তাই অজস্র তারা নেমে এসেছে নীচে। তাদের আলোয় এখন কিছুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। চোখ সয়ে এসেছে। অনেক অনেক দূরের পাহাড়ে দু-একটা আলোর বিন্দু জ্বলছে।

মদন বলল, 'সাব, হম যা রহে।'

'কোথায়?'

'চাক্কুতক। উধর কোই দুসরা গাড়ি মিলে ইয়া মেকানিক, লেকে আ যায়েগা। আপ ইধরি ঠরিয়ে।'

'সে তো থাকবই। কিন্তু অত দূর, এই অন্ধকার পথ...'

'ছোড়িয়ে সাব। যো হোগা, দিখা যায়েগা। ভগ্‌বানকা নাম লেকর— মুঝে যানাহি পড়েগা। দুসরা কোই উপায় নেহি হ্যায়।'

মদন দরজা খুলল। ওর সিটের নীচে থেকে একটা বড় ভোজালি টেনে বের করল। ঢকঢক করে বোতলভরতি জল ঢেলে দিল গলায়। তারপর ঢালু পথে নামতে শুরু করল। একটু পরেই মিলিয়ে গেল বাঁকে।

অচল সুমো, জংলাপাহাড়ে অন্ধকার রাত, আমরা তিনজন।

মামা সিগারেটে শেষটান দিয়ে ফেলে দিলেন।

'টুকলু, ভিতরে চল। এটা যাদের এলাকা, তারা যে-কোনও মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারে। সময় পাওয়া যাবে না।'

মাত্র কয়েক সেকেন্ড পার হয়েছে! হেডলাইট আগেই নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু তারার আলোয় তাকে চিনতে অসুবিধে হল না।

একটা লেপার্ড। দুলকি চালে ডানদিকের পাহাড়ি জঙ্গল থেকে নেমে এল রাস্তায়। একটু দাঁড়াল। তারপর খাদের জঙ্গলে বিদ্যুৎগতিতে ছুট দিল। নিশ্চয়ই শিকারের গন্ধ পেয়েছে।

পরক্ষণে চিঁ-চিঁ! ঝটপটানির শব্দ। কয়েকমুহূর্তের জন্য। আবার নিথর নৈঃশব্দ্য।

'উঃ! বাবারে!' অনন্তবাবুর আর্তস্বর।

'চেপে বসে থাকুন। একটু শব্দও এখানে সর্বনাশ করে দিতে পারে।'

মামা।' ফিসফিস করে বললাম, 'তোমার সেটটা চলছে?'

'তাই তো! দ্যাখ কাণ্ড! মাথা কাজ করছিল না।...এই তো! একবার ভিতরের লাইটটা জ্বাল।...পট্টনায়েককে আগে জানাই। তারপর ও যে নাম্বারটা দিয়েছে...এই যে বিক্রম পচনন্দা, চিফ কমান্ডার।'

মামা প্রথমে পট্টনায়েককে, পরে বিক্রমকে জানালেন। শুনেই ওরা ভীষণ উত্তেজিত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, বিক্রম আর্মির রেসকিউ ভ্যান পাঠাচ্ছে।

আধমিনিটও যায়নি, মামার ফোনে আবার আলো জ্বলে উঠল।

'হ্যালো, বলুন।...হ্যাঁ, হ্যাঁ, চাকু থেকে দশ-পনেরো কিলোমিটার। কী নাম?...টোবো?...ও.কে.।...ওয়ান মিনিট। আমরা যে যাচ্ছি, কীভাবে, কখন কোথায় পৌঁছোব, আপনি ছাড়া কেউ জানত?'...স্ট্রেঞ্জ।... প্লিজ কিপ ইট টপ সিক্রেট।...ও.কে।...দ্যাটস বেটার।'

জগুমামা ফোন ছেড়ে দিলেন। আবার তিনজনেই চুপ।

'ও-ওগুলো কী?'

ডানদিকের খাড়াই জঙ্গলে অনেকগুলো চোখ জ্বলছে। চোখগুলো নেমে আসছে এদিকে।

কালো-কালো ষণ্ডাগণ্ডা একদল চতুষ্পদ নেমে এসেছে রাস্তায়। দুলকি চালে হাঁটছে। সবুজ চোখগুলো দপদপ করছে। দলে কয়েকটি ছোটমাপের প্রাণীও রয়েছে।

'মনে হচ্ছে পাহাড়ি বুনো মোষ। গাউর-জাতের। এমনিতে নিরীহ। কিন্তু অচেনা আগন্তুক দেখলে রেয়াত করে না।'

বুনো মোষের দল লেপার্ডের পথ ধরে সার বেঁধে নেমে গেল খাদের জঙ্গলে।

'এখানে নিশ্চয়ই কোনও সল্ট-লিক আছে। জন্তুগুলো একপথ দিয়েই যাচ্ছে। টুকলু, সল্ট-লিক জানিস তো?'

'নুন-পাথর। ওদের শরীরে নুনের ঘাটতি মেটাতে চেটে যায়।'

'হ্যাঁ। ঠিক এই জায়গাটা দিয়েই এত জন্তু ক্রস করে। সেজন্যেই এখানে সড়কটা এত ড্যামেজ হয়েছে।...টুকলু, তোর মোবাইলটা একবার

দে।'

'কেন গো? একটুও সিগন্যাল নেই।'

'আরে বাবা, ওই নাম্বারটা তো আছে। যেখান থেকে কিছুক্ষণ আগে ফোন এসেছিল। শোনা গেল না। মদনের ফোনটা পেলে একবার মিলিয়ে দেখা যেত। সবগুলোই একই নাম্বার মনে হচ্ছে। কর্মা শেরিং-ই করেছিল। তার সঙ্গে একবার কথা বলি। তাকেও জানাই এই সিচুয়েশনটা।'

মামা আমার মোবাইলের নাম্বার দেখে-দেখে নাম্বার মেলালেন। লাউডস্পিকার অন করলেন। আমরাও শুনতে পাচ্ছি।

বেজে বেজে কেটে গেল। মামা আবার বোতাম টিপলেন। অনেকক্ষণ বাজার পরে একজন মহিলা ধরল।

মামা হিন্দিতে বললেন, 'ডক্টর কর্মা শেরিংকে দেওয়া যাবে?

'কর্মা শেরিং? কে কর্মা শেরিং? আমাদের এসটিডি বুথ বন্ধ হয়ে গেছে। সরি।'

'এসটিডি বুথ! কর্মা শেরিং এই নাম্বার থেকেই আমায় ফোন করেছিলেন।'

'চিনি না। এটা তাওয়াং-এর একটা ফোন বুথ। অনেকেই এখানে এসে ফোন করে যায়। কখন করেছিল?'

'একঘণ্টা আগে।'

'ও। মানে আটটায়। তারপরেই বন্ধ হয়ে গেছে। আমার ভাই ছিল তখন। তবে ও-ও বলতে পারবে না। কাউকে চিনে রাখা সম্ভব নয়।...সরি।'

মহিলা ফোন কেটে দিল।

'মামা, ওই দ্যাখো।'

আবার নতুন বিভীষিকা! নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেললাম।

কালো পাহাড়ের মতো প্রায় দশটা হাতি সড়কের উলটোদিক দিয়ে আসছে। শুঁড় দোলাচ্ছে। ওরা কি আমাদের সুমো দেখতে পেয়েছে?

'ভয় নেই। মনে হচ্ছে, ওরা একই উদ্দেশ্যে এসেছে।'

হ্যাঁ, তাই। বুনো হাতির দল খাদের ঢালু জঙ্গল দিয়ে নামতে শুরু

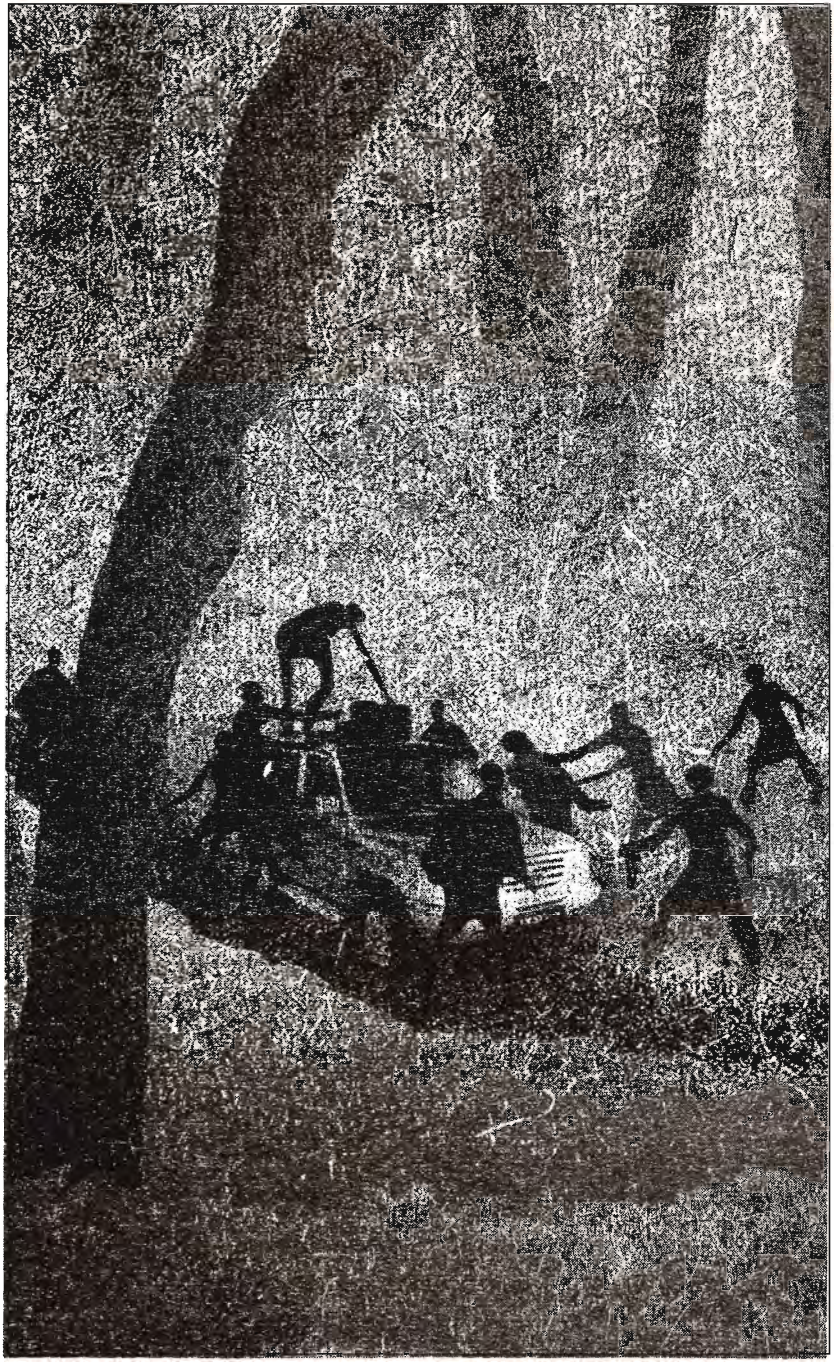

করেছে।

একটানা টেনশন আর নিতে পারছি না। ঠান্ডার অনুভূতি পাচ্ছি না। প্রায় দেড়ঘণ্টা কেটে গেছে...মদনের কোনও পাত্তা নেই। আর্মির লোকজন, গাড়িই বা কোথায়?

পিছন থেকে এই সময় কিছু মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বড়-বড় টর্চ ঘোরাতে-ঘোরাতে চড়াই বেয়ে উঠে আসছে জনাদশেক মানুষ।

আবছা আলোয় যেটুকু বোঝা যাচ্ছে, সকলেই স্থানীয় উপজাতি।

জোরে-জোরে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে মানুষগুলো এসে দাঁড়াল আমাদের গাড়ির পাশে। ওদের ভাষা বিন্দুবিসর্গ বোঝা যাচ্ছে না। নাহ্, মদন এদের মধ্যে নেই। তবে সে নিশ্চয়ই এদের পাঠিয়েছে।

গাড়ির সবক'টা কাচ তোলা। দরজা ভিতর থেকে লক করা। তবে তার ফাঁক দিয়েও ওদের একজনের গলা শোনা গেল। ভাঙা-ভাঙা হিন্দি।

'সাব! দরওয়াজা খুলো।'

মামা জানলার কাচ একটু নামিয়ে বললেন, 'কওন হো তুমলোগ?'

অন্ধকারে মিশে থাকা ওদের সেই একজন ভাঙা হিন্দিতে বলল, 'আপকা ড্রাইভার ভেজা হ্যায়। ইধর কোই মেকানিকস্ নেহি হ্যায়। যো হোগা, কাল সুবে হোগা। আব চলে।'

'কাঁহা?'

'আজ রাত হামরোকা ঘরমে রহো। জাদা দূর নাহি।'

জগুমামা মারাত্মক একটা ভুল করে ফেললেন! বোধহয় এতক্ষণের দম-আটকানো টেনশনে।

দরজার লক খুলে নেমে পড়লেন সড়কে।

সঙ্গে সঙ্গে পুরো দলটা মামাকে ঘিরে ফেলল। সাঁৎ করে একটা ভোজালি ঠেকিয়ে দিয়েছে গলায়।

'বাবু, রূপেয়া! রূপেয়া কাঁহা হ্যায়?'

'রূপেয়া নেহি হ্যায়।'

'নাহি হ্যায়! জলদি করো বাবু। যো হ্যায়, সব দে দো।'

কয়েকজন লাফ মেরে ঢুকে পড়ল ভিতরে। হিঁচড়ে আমাদের নামাল

রাস্তায়। অনন্তবাবু প্রায় অচেতন।

দু-তিনজন উঠে পড়েছে সুমোর চালে। লাগেজগুলো টেনে-টেনে ফেলছে রাস্তায়।

যা বোঝার বুঝে গেছি। আমরা ট্রাইবাল লুঠেরাদের খপ্পরে পড়েছি। মামার কাছে রিভলবার আছে। কিন্তু এতজনের সঙ্গে একটা রিভলবার—অসম্ভব!

শরীর কাঁপছে। সবক'টা ডাকাতের হাতে অস্ত্র। ভোজালি, বল্লম, কাস্তের মতো বাঁকানো কাটারি। এরা ভয়ঙ্কর নির্মম হয়। যা কিছু পাবে, সব লুঠপাঠ করবে। তারপর খুন করে রেখে চলে যাবে। কেউ খোঁজ পাবে না।

'আরে! আভভি খাড়া হ্যায় তুম? কাঁহা হ্যায় রূপেয়া? নিকালো? নিকালো! সবকো মারে গা!'

মামা পাথরের মতো। ভোজালিটা গলার কাছে স্থির। দুজন ওনার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে।

চার-পাঁচজন পড়েছে আমাদের ব্যাগগুলো নিয়ে। ভেতর থেকে জিনিসপত্র বার করে আনছে আর দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে উঠছে।

সে কী উল্লাস ধ্বনি! ওদিকের জঙ্গল থেকে একদল ছোট আকারের কোনও জন্তু নামছিল। চমকে, ভয় পেয়ে দুদ্দাড় করে ছুটে পালাল।

তিনটে নেকড়ে চেপে ধরেছে, অনন্তবাবু আর আমাকে। হিসহিস করে বলছে, 'জলদি! জলদি রূপেয়া দো।'

আমি পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে তুলে দিলাম। অনন্তবাবু এলানো অবস্থাতেই বের করেছেন একগোছা টাকা।

'জ্যাকেট খুলো! সুয়েটার খুলো।'

জ্যাকেট খুলছি। অবশ্য ঠান্ডার কোনও অনুভূতি পাচ্ছি না। একটাই অনুভূতি—আজ মৃত্যু সামনে।

হঠাৎ এঞ্জিনের গর্জন! এক নয়, একাধিক গাড়ি।

মুহূর্তে ডাকাতগুলো আমাদের টানতে-টানতে নিয়ে এল সুমোর আড়ালে। টর্চ নিভিয়ে দিয়েছে।

ফিসফিস করে নিজেরা কিছু বলাবলি করল। তার মধ্যে দুটো শব্দ

চিনতে পারলাম। আর্মি আর জিপ।

দলের সর্দার বিড়বিড় করে বলল, 'একঠো আওয়াজ করে তো, খত্-তম্।'

পরপর তিনটে জিপ উপরের পাহাড় থেকে নেমে আসছে। রাইফেলধারী ফৌজিদের দেখা যাচ্ছে। তিন জোড়া জোরালো হেডলাইটে জঙ্গল-সড়ক হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল।

ওদের হাতে-হাতে বড় টর্চ-লাইট। লাইটগুলো পাক খাচ্ছে পাহাড়ে-খাদে-সড়কে।

একটা চিৎকার শোনা গেল, 'মুখার্জি সাব! ডক্টর সাব! কাঁহা হ্যায় আপলোগ?'...

তিনটে জিপ এই বাঁকের কাছাকাছি এসে স্লো হয়েছে। অ্যানাউন্সমেন্ট করেই চলেছে, 'ডক্টর সাব?...মুখার্জি সাব?...কম্যান্ডান্টসাবনে ভেজে হ্যায়...কাঁহা হ্যায়?'

পাশ থেকে ভোজালিধারী অস্ফুটে শাসাচ্ছে, 'একদম চুপ! সাইলেন্ট! খতম!'

কনভয়টা ধীর ধীরে আমাদের অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। অসহায়ের মতো দেখছি, কিছু করার নেই।

ঘোষণা চলছে...টর্চের ফোকাসগুলো ঘুরছে লাইট হাউসের মতো।

হঠাৎ ওদের কেউ বলল, 'সাব! সাব! রুকিয়ে।'

কনভয় দাঁড়িয়ে গেল।

'কেয়া হুয়া?'

'দেখিয়ে! উধর! একঠো টাটা সুমো।'

জোরালো আলো এসে পড়েছে গাড়ির ওপর।

'হাঁ হাঁ! বিলকুল সান্নাটা। কোই নেহি হ্যায়।'

'হাঁ সাব। লেকিন বাহার মে সামান পড়া হ্যায়। কিঁউ?'

'রাইট য়ু আর!...স্টপ!...আভি চলো।...উতরো!'

ধপ্-ধপ্-ধপ্...। জিপ তিনটে থেকে প্রায় পনেরোজন সশস্ত্র ফৌজি নেমে গেল সড়কে।

খট্...খট্...খট্...! বুটের আওয়াজ। রাইফেলে পোজিশন নিয়ে গাড়ির

দিকেই এগিয়ে আসছে।

কী হবে এবার? লড়াই শুরু হবে? আমাদের গলায় চাকু ধরে রফা করবে ডাকাতগুলো?

দু-তিন সেকেন্ডের মধ্যে যেন ম্যাজিক ঘটে গেল। হঠাৎ দেখলাম, আমরা শুধু তিনজন। আশেপাশে কেউ নেই।

ধুপ-ধাপ্ শব্দ। ঢালু জঙ্গল বেয়ে ছুটে পালাচ্ছে ডাকাতের দল। নিশ্চয়ই কোনও শুঁড়িপথ আছে খাদের ঢালে।

আওয়াজ পেয়ে গেছে জওয়ানরাও। বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসেছে গাড়ির কাছে। দেখতে পেয়ে কয়েকজন প্রায় পাঁজাকোলা করে আমাদের নিয়ে বসিয়েছে ওদের একটা জিপে। বাকিরা তখন শব্দ লক্ষ্য করে অন্ধকারেই 'দনাদ্দন' ফায়ারিং করে যাচ্ছে।

'শালে! ডরপোক চুহে! ডাকুকে বাচ্চে! মার ডালো!

প্রবল আক্রোশে গুলি চালাচ্ছে আর গর্জন করেছে, 'আজ দো-চারঠো জরুর উড়ে গা। শালে!'

অনন্তবাবু জিপের পেছনের সিটে লম্বা হয়ে আছেন। মামা এবং আমি বসে।

'সাব, আয়্যাম ক্যাপ্টেন টোবো।...আপলোগ আজ বড়ি সৌভাগ্যসে বাঁচ গয়ে। কুছ দিন হুয়া, ইস ইলাকামে এক খতরনাক ট্রাইবাল গ্যাং অপারেট কর রহা হ্যায়। হামলোগোকাভি কোশিশ জারী হ্যায়, পাকড়নেকা।'...

৪

কাল রাতের ঘটনা এখনও ছড়িয়ে আছে শরীরে। মনেও। ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। হিংস্র ডাকাতের পাল্লায় আমরা আগে কখনও পড়িনি।

বমডিলার আর্মি ক্যাম্প পৌঁছেছি রাত দুটোর পরে। গেস্ট হাউসের কটেজগুলো ছিটছাম। টেনশন আর ক্লান্তি ঘুমের ওষুধের মতন কাজ করেছিল। দুটো রুটি আর চিকেন নাকেমুখে গুঁজে কম্বলের তলায় ঢুকে

পড়েছিলাম। অচেতনের মতো ঘুমিয়েছি।

কিন্তু আজ সকাল থেকে হতভম্ব হয়ে আছি অনন্ত সরখেলের পরিবর্তন দেখে। র‍্যাডিক্যাল চেঞ্জ! কাল রাতে যে লোকটা অর্ধমৃত অবস্থায় চিৎপাত হয়ে পড়ে ছিল, সেই লোকটাই সকালে অন্য মানুষ। কাল রাতের বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই বডি ল্যাংগুয়েজে। দিব্যি চনমনে, ফূর্তিতে ডগমগ।

আমি ওঠার আগেই বিছানা ছেড়েছেন। গেস্ট হাউস থেকে বাইরে হাঁটতে বেরিয়েছেন। নিজে দুজনের চায়ের বন্দোবস্ত করে আমায় বিছানা থেকে তুলেছেন। তাড়া লাগিয়েছেন চটপট রেডি হয়ে নেওয়ার জন্যে।

এই পর্যন্ত তবু সইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু পরের স্টেজে অনন্তবাবু আমায় (মামাকেও নিশ্চয়ই) গভীর ধন্দে ফেলে দিয়েছেন। ধন্দটা হল, ইনি আমাদের অনন্ত সরখেল তো!

দশটা নাগাদ রেডি হয়ে যখন বমডিলা থেকে ডোরাকাটা জিপে উঠছি, হঠাৎ অনন্তবাবু বললেন, 'স্যার, বাষট্টিতে এই বমডিলা পর্যন্ত চিনারা এসেছিল?'

'হ্যাঁ। পরে নিজেরাই ফেরত চলে গেছিল। কেন বলুন তো?'

'না, তেমন কিছু নয়। সকালে হেঁটে-হেঁটে দেখছিলুম চারপাশে। অপূর্ব জায়গা! আর তখনই একটা কবিতার ছন্দ মাথায় চলে এল।'

'অ্যাঁ!—আবার কবিতা? প্লিজ অনন্তবাবু, আর কবিতা-টবিতা বলবেন না।'

'কেন ভাই টুকলু? কবিতা কী দোষ করল?'

'দোষ করেনি? কাল কী হল? ভালুকপং-রংটাং কী একটা কবিতা আওড়ালেন, ব্যস! তারপর ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটল।'

'যাচ্চলে! কবিতার সঙ্গে ওসবের কী সম্পর্ক? স্যার, টুকলু না পুরো সুপারস্টেশন হয়ে যাচ্ছে!'

'সুপারস্টেশন! মানে?'

'মানে স্যার কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ওর মধ্যে স্যার নতুন আমদানি হয়েছে।'

'ও। সুপারস্টিশাস। হ্যাঁ, তাই দেখছি। আপনার কবিতার মতো।'

'বলব স্যার? লাইনগুলো নইলে চলে যাবে।'

'বলে ফেলুন।'

'বমডিলা বম-বম, স্থান অতি উত্তম। এখানে আসে চিনারা, তারপর এলুম আমরা। কেমন হয়েছে স্যার?'

'আগের চেয়ে বেটার। কিন্তু চিনাদের পরে আমরা কেন? এই সাঁইত্রিশ বছরে কয়েকলাখ মানুষ এসেছে।'

'হেঁ হেঁ। ওটা স্যার মেলাবার জন্যে। তবে যদি ভি. আই. পি. ধরেন, ওদের পরে তো আমরাই। মাঝে সব এলেবেলে। না কি?'

মামা উত্তর দেননি। কীই বা দেবেন? দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, দলাই লামা সবাইকে যদি এলেবেলে বলা হয়, তার কোনও জবাব হয়!

আমি বরং প্রসঙ্গ ঘোরাতে বলেছি, 'কাল রাতের ঘটনা ভাবলে ভয় লাগছে না অনন্তবাবু?'

অনন্তবাবু অমায়িক হেসেছেন, 'ভয়! এ ভয়ে কম্পিত নয় বীরের হৃদয়। পাহাড়-জঙ্গল-আকাশ-ঝরনা, সেই রূপে ডুবে মর না!'

কী যে বলছেন, বুঝতেই পারছি না। কবিতা রোগে আক্রান্ত হয়ে নির্ঘাত ভদ্রলোকের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে! হাফ আগেই ছিল, এখন ফুল—!

আমরা এখন দিরাং এসে গেছি। ড্রাইভার জিপ থামাল একটা মাঝারি গোছের লোকাল 'ধাবা'র পাশে।

'চায়ে অর খানা খা লিজিয়ে। ইসকে বাদ নেহি রুকেঙ্গে।'

ওরা তিনজন ভিতরে ঢুকে গেল। রাতের ঘটনার পর টোবো কোনও ঝুঁকি নেননি। দুজন আর্মড জওয়ানকে দিয়ে দিয়েছেন এই জিপে।

বমডিলা থেকে পথ যত এগিয়েছে, অরুণাচল তত তার রূপ খুলেছে। অগাধ পাহাড়ের দিগন্তছোঁয়া ঢেউ, সবুজ আর সবুজ। সবুজের মাঝেও কত রঙের বাহার। কত রকমের ফুল, কত রকমের রডোডেনড্রন, কত রঙের অর্কিড। পাহাড় থেকে মাঝে-মাঝেই ফেনিল ঝরনা, কখনও অনেক উঁচু থেকে জলপ্রপাতের মতো উচ্ছ্বসিত। সব গিয়ে মিশেছে কোনও পাহাড়ি নদীতে।

দিরাঙে যেমন দিরাং নদী। ড্রাইভার বলেছে, এ নদী নীচে নেমে মিশেছে কামেং নদীতে।

নদীর দু-ধারে সবুজ পাইন-বনে ছাওয়া আপেল-বাগান। কাছে-দূরে অনেকগুলো অর্কিড-নার্সারি। আর পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে নানামাপের কাঠের বাড়ি। নীল-সাদা আর্মি ক্যাম্প, হলুদ সরকারি অফিস রয়েছে।

এই জনপদের বাসিন্দাদের রুচি দেখে অবাক হতে হয়। প্রত্যেক বাড়ির সামনের বারান্দা জুড়ে টবে ফুটে আছে নানারঙের নানাজাতের অর্কিড। উজ্জ্বল বেগুনি, গোলাপি, হলুদ, লাল...কত রং। চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে।

ধাবায় ঢুকে পুরি-সবজির অর্ডার দিয়েছি। অনন্তবাবু বেভুলোর মতো তাকিয়ে আছেন। নির্ঘাত আবার কোনও কবিতা এসেছে!

'আসুন অনন্তবাবু। ভেতরে বসুন।'

'অ্যাঁ-হ্যাঁ স্যার। উঃ...একটুর জন্যে চলে গেল। দিরাং...দিরাং...দিরাং.. তোমার...নাহ্! মিলছে না।'

আমার মোবাইলে এখন পুরো সিগন্যাল এসে গেছে। দেখেই মনে পড়ে গেল।

'মামা, কর্মা শেরিং! ফোন-রহস্যটা জানা হয়নি।'

'হুঁ।'

'একবার পচনন্দাকে ফোন করলেই তো হয়। তিনি নিশ্চয়ই কর্মার মোবাইল নাম্বার যোগাড় করে দিতে পারবেন।'

'রাইট!' মামা বোতাম টিপতে শুরু করলেন।

কথা হল। আধমিনিটের মধ্যে পচনন্দার ফোন এল।

'ইয়েস...টুকলু নোট কর তো...কর্মা শেরিং...9435...। কী বললেন? পাঞ্চেন গোম্বু? ইনিও অ্যাসিস্ট্যান্ট? বলুন...। আচ্ছা...। বুঝেছি। আপনিও ট্র্যাক রাখুন। আমিও ট্রাই করছি।...ও. কে...।'

ফোন রেখে মামা বললেন, 'প্রোফেসর নরবু নিজে মোবাইল ইউজ করেন না। এই দুজন সবসময় সঙ্গে থাকে। ওদের মোবাইলে কনট্যাক্ট করলে নরবুকে পাওয়া যায়।'

জগুমামা নিজের ফোন থেকে পরপর দুটো নাম্বার ফোন করলেন। দুটো ফোনই চালু আছে। রিং হচ্ছে...হচ্ছে...বাজতে-বাজতে কেটে গেল। দু-দুবার। অর্থাৎ ওরা ফোন ধরলেন না।

'অদ্ভুত! মিস্টিরিয়াস!' চা খেতে-খেতে মামা বললেন, 'অথচ এই কর্মাই কাল ভালুকপং চেকপোস্টে আমাদের খবর নিতে ড্রাইভার মদনকে ফোন করেছিল! কী হল ওদের?'

'হয়তো এমন কোনও কাজে আছে, ধরতে পারছে না। তোমার নাম্বার তো ফোনে ওঠে না। অথবা এই মুহূর্তে ফোন ওদের কাছাকাছি নেই।'

'তোর ফোন থেকে কর। দেখি।'

করলাম। একই রেজাল্ট। নো রিপ্লাই। মামার ভ্রূ দুটো ধনুক।

'তার মানে প্রোফেসর নরবুকে পাওয়ার কোনও উপায় নেই?'

অনন্তবাবু বোধহয় কিছুই শুনছিলেন না। অন্যজগতে বিচরণ করছেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এসে গেছে স্যার! দিরাং দিরাং দিরাং, তোমার রূপের পরশ নিলাম...। কেমন হয়েছে স্যার?'

'ভালো। একটা কাজ করুন প্লিজ। যখন যা আসছে, তখনই নোটবুকে লিখে ফেলুন! পরে একসঙ্গে শুনব।'

'ঠিক বলেছেন স্যার!' অনন্ত সরখেল চায়ের কাপ নামিয়ে হন্তদন্ত হয়ে গাড়ির দিকে গেলেন।

আমরাও উঠে পড়েছি। মামা গম্ভীরমুখে সিগারেট ধরিয়ে জিপের দিকে এগোচ্ছেন। এই সময় সাঁ করে আরেকখানা জিপ এসে থামল আমাদের পাশে।

সোচ্ছাসে এগিয়ে এলেন যে দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক, সাত বছরে তিনি খুব একটা বদলাননি।

'হাই অর্ণব!'

'হাই আঙ্কল!'

মামা অবাক হয়ে বললেন, 'পট্টনায়েক! আপনি! কোত্থেকে? কাল রাতেই দিল্লিতে আপনার সঙ্গে কথা হল!'

'ঠিকই বলেছেন। আমি দেন অ্যান্ড দেয়ার ডিসিশন নিলাম, আই

মাস্ট কাম। মর্নিং ফ্লাইটে দিল্লি থেকে গুয়াহাটি। সেখান থেকে আর্মি হেলিকপটার। ফ্লাইট লেট না করলে আপনাদের বমডিলাতেই ধরে ফেলতাম। বেরিয়ে পড়েছেন শুনে দিরাং চলে এসেছি। ক্যাম্পে ছিলাম। লোককে বলা ছিল। আপনাদের ড্রাইভার ফোন ধরছিল না। তাই লোকেট করতে পারেনি।'

'ওয়াট আ সারপ্রাইজ! আচ্ছা, এদের কি ফোন না ধরার রোগ আছে নাকি মশাই?'

'কেন বলুন তো?'

'কর্মা, পাঞ্চেন কারোর ফোনে পাচ্ছি না। পচনন্দা নাম্বার দিল। তাই নরবুর সঙ্গে কিছুতেই কনট্যাক্ট হচ্ছে না। কোথায় আছেন...তাওয়াং না অন্য কোথাও?'

'পট্টনায়েক আঙ্কল, পরশু সকালের পরে নরবুর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ হয়েছে আপনার?'

'নাঃ।' পট্টনায়েক চিন্তিতভাবে বললেন, 'কিন্তু নরবুর ওপর আমাদের লোকজনকে সবসময় নজর রাখতে বলেছি। কোনও বিপদে পড়লে যাতে রেসকিউ করতে পারি। আজ সকাল পর্যন্ত ট্র্যাক রেখেছিল। দিরাং-এ আমায় জানাল, কোন ফাঁকে উনি যে ল্যাব ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন, জানে না!'

'কেলেংকারি! তার মানে তো অথৈ জল। চারিদিক পাহাড় আর জঙ্গল। কোন জঙ্গলে ঢুকেছেন, কী করে খোঁজ পাবে?'

'পাবে। ডক্টর মুখার্জি। ঠিক খুঁজে বের করবে। একটু সময় দিন।'

'একা গেছেন?'

'না। কর্মা, পাঞ্চেন দুজনই সঙ্গে আছে। বাড়ির কাজের লোক জানিয়েছে, তিনজন সকালেই একসঙ্গে বেরিয়ে গেছে। কোথায়, জানে না।'

'সঙ্গে নিশ্চয়ই ড্রাইভার আছে। তার মোবাইলে ফোন করলেই তো জানা যেতে পারে।'

'গ্রেট!' পট্টনায়েক বললেন, 'এইখানেই আপনি আমাদের থেকে ডিফারেন্ট। এত সিম্পল সলিউশন। অথচ মাথায় আসেনি।...দেখছি।'

ফোনটা বের করে একটু দূরে গিয়ে কারও সঙ্গে কথা বললেন। তারপর বললেন, 'লেট্‌স স্টার্ট ফর তাওয়াং।'

'হ্যাঁ, চলুন। রোদ ফিকে হয়ে গেছে। তাওয়াং পৌঁছতে-পৌঁছতে সন্ধে পেরিয়ে যাবে।'

'না, যাবে না।'

'যাবে না?'

'না, কারণ আমরা জিপে যাব না।'

'তার মানে হেলিকপটারে?'

'সিওর। যেটায় আমি উড়ে এসেছি, সেটা ফাইভ-সিটার। আমরা একবার থামব সেলা টপ-এর কাছে। যশোবন্ত ওয়ার-মেমোরিয়াল ক্যাম্পে। ওখানে খোঁজ নেব, ওদের কাছে নরবুর কোনও ইনফর্মেশন এসেছে কিনা। না হলে তাওয়াং। তবে আমার ধারণা, তার মধ্যে খবর পেয়ে যাব। আওয়ার সিকিওরিটি নেটওয়ার্ক ইস এনাফ স্ট্রং।'

৫

একেবারে অন্যরকম অভিজ্ঞতা। বিমানপথে দেশবিদেশ যাওয়ার সুযোগ হলেও, এই প্রথম কপ্টারে চড়লাম। এবং বুঝলাম, কেন আর্মিতে কপ্টারের এত প্রয়োজন। ভিতরে অক্সিজেন, এসি সিস্টেম, সব ব্যবস্থাই মজুত। এমনকী ফায়ারিং-এর ডাক্‌ট পর্যন্ত।

কানে তালা ধরে যাচ্ছে আওয়াজে। একের পর এক পাহাড় টপকে যাচ্ছি অনায়াসে। পাইলট চালাচ্ছেন সড়কের পাশ দিয়েই। পাইন-ফার্ন-মস-রডোডেনড্রন-বাঁশ-বেতের ঘনসবুজ জঙ্গল, ঝরনা, পাহাড়ের খাদ সব দূরবিনে স্পষ্ট। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের ঢালে পাহাড়ি গরু-ছাগল-ইয়াক চরে বেড়াচ্ছে, ঘাস খাচ্ছে। মাঝে মাঝে ছোট-ছোট জনবসতি। রঙিন পোশাকের পাহাড়ি আদিবাসীরা চাষ করছে, পথ বেয়ে হাঁটছে।

জংলা পাহাড় হঠাৎ কমে আসছে। একটু ন্যাড়া-ন্যাড়া। রুক্ষ।

হেলিকপ্টার হঠাৎ একটা উড়ান দিল। অনেকটা উঠে গেল উঁচুতে। দূরে বিস্তীর্ণ এলাকা রুক্ষ, পাথুরে। সরু ফিতের মতো হাইওয়ে দেখা যাচ্ছে অনেক নীচে।

'আমরা সেলা টপ-এর কাছে এসে পড়েছি। এবার একটু নামব। কারও নিশ্বাসের কষ্ট হলে বলবেন। অক্সিজেন পাউচ আছে।'

দূরবিনে দেখা যাচ্ছে, রুক্ষ বিস্তীর্ণ প্রান্তর। পাহাড়শ্রেণি নীচে। পুতুলের ঘরবাড়ি। আর্মি ক্যাম্প, কংক্রিটের একটানা বাড়ি। রঙিন তোরণ, ভারতের পতাকা উড়ছে কংক্রিটের বাড়িটার ওপরে। পিঁপড়ের মতো বেশ কিছু মানুষ। ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে।

পাইলট মাইক্রোফোন তুলে কিছু সাঙ্কেতিক ভাষা বললেন। সঙ্গে -সঙ্গে জবাব এল।

হেলিকপ্টার পাক খেতে-খেতে দ্রুত নামছে। চারিদিকে কালো মেঘ উড়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা।

'পট্টনায়েক, এটাই তাহলে যশোবন্ত্ নগর।'

'জি সার। লম্বা বাড়িটা যশোবন্ত্ মেমোরিয়াল।' পাইলট জবাব দিল, 'নাইনটিন সিক্সটি টু-তে চাইনিজ অ্যাগ্রেশনের সময় এখানে ইন্ডিয়ান আর্মি দারুণ ফাইট দিয়েছিল। যশোবন্ত্ সিংহ একা ছত্রিশ ঘণ্টা লড়েছিলেন। যখন দেখলেন, পারছেন না, হি কমিটেড সুইসাইড। ওই বাড়িতে পুরো হিসট্রি আছে। সামনেই সেলা টপ।'

ঘড়-ঘড় করতে-করতে হেলিকপ্টার জমি স্পর্শ করল।

কয়েকজন অফিসার ছুটে এলেন আমাদের দিকে। পট্টনায়েককে স্যালুট করে বললেন, 'সার, কম্যান্ডার পচনন্দা সাব ফোন করেছিলেন। খুব জরুরি দরকার। ধরব?'

পট্টনায়েক মাথা নাড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন একটা ফোন এসে এগিয়ে দিলেন।

'ইয়েস। বলো।...কী?...পেয়েছ?...আচ্ছা। তোমার ফোর্স পাঠিয়েছ?... ওদের বলো, আমরা না পৌঁছোন পর্যন্ত যেন ওয়েট করে।...ও. কে.।...'

পট্টনায়েক খুব উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'ডক্টর মুখার্জি, নরবুর ইনফর্মেশন। ড্রাইভার বলল, নরবু আর শেরিং-গোম্বুকে জং ফলসের

সামনে ছেড়ে দিয়েছে। ওকে চলে যেতে বলেছিলেন ওরা। কাজ শেষ হলে ডেকে নেবেন। পচনন্দা সঙ্গে-সঙ্গে ফোর্স পাঠিয়েছে। ওখানে একটা হাইডেল পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে। যেসব লেবার কাজ করছে, তারা বলেছে, তিনজন মানুষ গাড়ি থেকে নেমে ফল্‌স পেরিয়ে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে গেছে।'

'গুড। অন্তত জায়গাটা লোকেট করা গেছে। ফোর্স জঙ্গলে ঢুকেছে?'

'না। অর্ডার চাইছিল। আমি বলেছি, আমরা পৌঁছোন পর্যন্ত অপেক্ষা করুক।'

'রাইট ডিসিশন। এখনই চলুন।'

'সাব, কফি।' ফৌজিরা ট্রেতে তিন কাপ কফি নিয়ে এসেছে।

'থ্যাঙ্কিউ। পরে হবে।'

অনন্তবাবু ডায়েরি-পেন নিয়ে মেমোরিয়ালের ছাদে উঠেছিলেন। নিশ্চয়ই নতুন কবিতা। কপ্টারের পাখার শব্দ এবং আমাদের ডাক শুনে দুদ্দাড় করে নেমে এলেন।

'বুঝলে টুকলু, কত কিছু দেখার ছিল! কপালে নেই।' হতাশ গলায় বললেন।

ঘুরতে-ঘুরতে কপ্টার আবার অনেকখানি উঁচুতে উঠে গেল। সেলা টপ সবচেয়ে উঁচু, প্রায় চোদ্দোহাজার ফুট।

'সেলা টপ দেখতে পাচ্ছ? ও-ই যে। কয়েকটা টুরিস্ট গাড়ি দাঁড়িয়ে।'

'হ্যাঁ আঙ্কল। নীচে...ওই যে অনেকখানি জল...?'

'সেলা লেক। বিরাট বড়। ন্যাচারাল লেক, এই এলাকার ওয়াটার সোর্স। শীত পড়লে বরফ হয়ে যায়।'

'ওটা...ওটা কী...? দেখুন, দেখুন।'

দূরবিনটা পট্টনায়েককে এগিয়ে দিয়েছি।

'হ্যাঁ, তাই তো!...বোট বা লঞ্চ নয়!...কী ওটা?...মুখার্জিসায়েব, দেখুন।'...

'হুঁ।...কিছু একটা ধীরে-ধীরে মুভ করছে। পিঠটা রোদে চকচক করছে। পাইথন নাকি?...এখানে তো কুমির-টুমির নেই।...বোঝা যাচ্ছে না।'

'দাঁড়াতে বলব?'

'না-না। আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি জং ফল্‌স।'

আঁকাবাঁকা ফিতের মতো সড়ক আবার ঢুকে গেছে পাহাড়ে-জঙ্গলে। হেলিকপ্টার নেমে এসেছে নীচে। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই জলপ্রপাত দেখা গেল। পাহাড়ের উপর থেকে রুপোলি জলধারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দু-তিনটে বাড়ি, হাই-টেনশন কেব্‌ল-তার, বড় ট্রান্সফরমার, জেনারেটর। চার-পাঁচটা ডোরাকাটা গাড়ি, গোল হয়ে দাঁড়ানো জলপাইরঙের পোশাকের ফৌজিদের দল।

তিনটে পাহাড়ের ঢাল দিয়ে কপ্টার সোজা নেমে এল।

আমরা নেমে দাঁড়াতেই সশস্ত্র জওয়ানদের দলটি স্যালুট ঠুকল।

'সার, আমি ক্যাপ্টেন জয়বাহাদুর ছেত্রী।' তরুণ অফিসার বললেন, 'আধঘণ্টা এখানে এসে পৌঁছেছি। ওই ফলস-এর পাশ দিয়ে পিছনের জঙ্গলে যাওয়ার একটা পায়ে-চলার পথ আছে। ট্রাইবালরা যাতায়াত করে। ওরা তিনজন ওই পথেই গেছেন।'

'ও. কে.। দেন লেট্‌স মুভ।'

অবর্ণনীয় দৃশ্য! দুর্দম বেগে জলস্রোত বহু উঁচু পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নীচের পাথুরে জমিতে। লক্ষ-কোটি জলকণায় সূর্যালোক পড়ে রামধনু সৃষ্টি হয়েছে আকাশে।

অনন্ত সরখেল হাঁ করে দেখছেন। হাতে ডায়েরি। মামা বললেন, 'আপনি বরং থাকুন অনন্তবাবু। আমরা ঘুরে আসি।'

'সেই ভালো স্যার।'

মনে হল, উনি বেঁচে গেলেন।

জং জলপ্রপাতকে বাঁয়ে রেখে জঙ্গলে ঢুকছি। সামনে ফৌজ, পেছনেও। নরম মাটি, পিছল। জলবিন্দু এখানেও উড়ছে।

চড়াই পথ। ঠাসাঠাসি গাছে ভিতরে আলো-আঁধারি। চেনা-অচেনা কতরকম গাছ। পাইন, বাঁশ, বেত জড়াজড়ি করে আছে। অসংখ্য লতাপাতার ঝোপ।

কয়েকটা লোমশ কাঠবিড়ালি টুপটুপ করে গাছে উঠে পড়ল। বুনো খরগোশ ছোটাছুটি করছে, ঝোপের ফাঁকে মুখ বের করে ছিল

বনবিড়াল। লুকিয়ে পড়ল।

'এই জঙ্গলে হিংস্র জন্তু নেই?'

'বহোৎ আছে। ক্লাউডেড লেপার্ড অনেক। শের, ভালুও আছে। রাতে বের হয়। সবচেয়ে ভয় সাপকে।'

বলতে-বলতে সরসর করে কী একটা পাশ দিয়ে ঢুকে গেল। মামা বললেন, 'পাহাড়ি গিরগিটি। ডেঞ্জারাস। কাঁকড়া বিছেও আছে নিশ্চয়ই। এরা সাপের চেয়ে কম বিষাক্ত নয়।'

সামনের দিকে 'ফটাফট' শব্দ! একজন ফৌজি লাঠির ডগায় তুলে ছুঁড়ে দিল ভিতরে। সাপ!

'এই জঙ্গলে রাসেলস ভাইপার প্রচুর। বাংলায় যাকে বলে চন্দ্রবোড়া। কেউটের চেয়েও বিষাক্ত।'

দশ মিনিট দম-আটকে এগোবার পর খানিকটা সমতল ভূমি। একটু ফাঁকা। দু-চারটে পাথর পড়ে আছে। ঝিরঝির শব্দ। ওই জলপ্রপাতেরই একটা ক্ষীণ শাখা ঝরনা হয়ে নামছে।

পরক্ষণে আমাদের পা মাটিতে গেঁথে গেল।

ঝরনা যেখানে পাহাড় চিরে নামছে, তার পাদদেশে বড় একটি বোল্ডারে হেলান দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন একজন প্রৌঢ় মানুষ। পাশে কয়েকটা ব্যাগ, লাঠি।

আরেকজন মানুষ উদভ্রান্তের মতন পায়চারি করছেন। আমাদের শব্দ পেয়ে ছুটে এলেন।

'এসে গেছেন! এসে গেছেন! আমি—আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। স্যর...স্যর...'

'আপনি?'

'আমি কর্মা শেরিং। উনি স্যর। প্রফেসর নরবু। উঃ, যা ঘটে গেল—'

'আরেকজন? পাঞ্চেন গোম্বু? তিনি...?'

'পালিয়েছে! শয়তানটা সর্বনাশ করে পালিয়ে গেল!'

'সর্বনাশ? প্রফেসর—'

'ডেড! স্যর ডেড! ওকেই খুন করল স্কাউন্ড্রেলটা।'

মামা-শেরিংয়ের কথোপকথনের মধ্যে পট্টনায়ক ছুটে গিয়ে বসে পড়েছেন প্রফেসরের অসাড় শরীরের পাশে। পালস দেখছেন।

'বেঁচে নেই! বেঁচে নেই!' কর্মা শেরিং চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমার চোখের সামনে ছটফট করতে করতে মরে গেলেন স্যর। কিছুই করতে পারলাম না। ছুটে পালিয়ে গেল শয়তানটা। উঃ! ওকে যদি পেতাম।'

জগুমামা দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়েছেন। এগিয়ে গিয়ে শেরিংয়ের দুই কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, 'কুল ডাউন শেরিং।...শান্ত হোন্। আমরা বুঝতে পারছি, আপনার মানসিক অবস্থাটা। একটু খুলে বলুন প্লিজ।'

'আপনি?'

'আমি জে বি মুখার্জি। আপনার সঙ্গে পরশু বিকেলে ফোনে কথাও হয়েছে। আপনি আমাদের ড্রাইভার মদনের ফোনে ফোন করেছিলেন—।'

'আমি? না-না ডক্টর মুখার্জি, আপনি বোধহয় ভুল করছেন। আমি কোনও ফোন-টোন করিনি। স্যর দুদিন আগে, ল্যাবে কাজ করতে করতে বললেন, আপনারা দিল্লি থেকে আসছেন। প্ল্যান্ট-কালেকটররা নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে, সেই ব্যাপারে ইনভেস্টিগেট করার জন্যে। বিজ্ঞানী হিসেবে আপনার নাম অবশ্য স্যর, আগেই শুনেছি।'

'ও। আপনি ফোন করেননি! পরেও আমার ভাগ্নের মোবাইলে একই ল্যান্ড নাম্বার থেকে ফোন এসেছিল। পরে শুনলাম, সেটা তাওয়াং-এর এস. টি. ডি. বুথের নাম্বার।'

'মে বি। বাট বিলিভ মি স্যর, ফোনের বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।'

'ও. কে.। প্লিজ, ডিটেলে বলুন, কী ঘটল।' ফৌজিরা নরবুর নিষ্প্রাণ দেহটাকে তুলে এনে ঘাসজমিতে শুইয়ে দিয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে মামা বললেন, 'ক্যাপ্টেন ছেত্রী! বডিকে সাবধানে নিয়ে যেতে হবে।...ইয়েস, স্টার্ট!'

'কী বলব স্যর? তিনজনে সকাল আটটায় ল্যাব থেকে বেরিয়ে

এখানে এসেছি। ওই জঙ্গলে ঢুকে অনেক গাছ দেখা হল। কয়েকটা স্পিসিস কালেক্ট করা হল। প্ল্যান্ট কালেকটরদের না পেয়ে আমরাই করছিলাম।...

বারোটা নাগাদ স্যর বললেন, খুব টায়ার্ড লাগছে। তোমরা আরও কিছু কালেক্ট করো। আমি একটু রেস্ট নিয়ে আবার তোমাদের সঙ্গে জয়েন করব। তার একটু আগে তিনজনে ওই ঝরনার পাশে বসে লাঞ্চ করেছি।

পাঞ্চেন আর আমি ফের জঙ্গলে ঢুকতে যাচ্ছি। পিছন থেকে স্যার বললেন, শোনো। তোমাদের কাছে কোনও গা গুলোনোর ওষুধ আছে? আমার খুব আনইসি ফিলিং হচ্ছে।

পাঞ্চেন বলল, আছে। ব্যাগ থেকে দুটো ট্যাবলেট বের করে স্যারকে বলল, খেয়ে নিন। ঠিক হয়ে যাবে।

স্যার ওয়াটার বটল খুলে পরপর দুটো ট্যাবলেট গিলে ফেললেন।

আমরা কয়েক-পা ভেতরে ঢুকেছি, হঠাৎ পিছন থেকে স্যারের আর্তনাদ ভেসে এল।

দেখি, স্যার বুকে হাত দিয়ে 'উঃ উঃ' করে গোঙাচ্ছেন।

ছুটে এলাম। কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। স্যার জোরে জোরে শ্বাস টানছিলেন, খাবি খাচ্ছিলেন। চোখের সামনে একমিনিটের মধ্যে স্থির হয়ে গেলেন! ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক।

আমি সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্চেনের হাত চেপে ধরলাম, এ কী হল? তুমি স্যারকে কী ওষুধ খাওয়ালে? শিগগির দেখাও।

পাঞ্চেন বলল, দেখাব না। যা হয়েছে, ঠিক হয়েছে। তুমি কী করবে?

আমি ওকে চেপে ধরলাম। কিন্তু ও আমার চেয়ে অনেক স্ট্রং। আমায় ঘুষি মেরে ফেলে পালিয়ে গেল! যাওয়ার সময় বলে গেল, স্যারের কাগজপত্র সব নিয়ে গেলাম। ওনার রিসার্চ আমিই শেষ করব। আমার নামে পাবলিশ হবে। তুমি আঙুল চুষবে।...'

'আপনি ছেড়ে দিলেন একটা খুনিকে?' পট্টনায়েক বলে উঠলেন।

'কী করব? আমার অবস্থাটা বুঝুন। স্যারের ডেডবডি ফেলে কী

করে যাব? আমি একদম একা। টোটালি পাজ্‌ল্‌ড।'

'আপনার এবং পাঞ্চেন গোম্বুর ফোনে আমরা দুপুর দুটো নাগাদ বেশ কয়েকবার ট্রাই করেছি। বেজে-বেজে কেটে গেছে।'

'ওয়াট? আমার ফোনে?' শেরিং প্যান্টের পকেট থেকে সেলফোন বের করলেন, 'এই তো আমার ফোন।...কোথায়?..তাই তো...তাই তো।'

দেখতে-দেখতে তাঁর গলার স্বর নীচে নেমে এল।

'ইস্‌-স্‌...! সকালবেলায় স্যরের কথায় ফোনটা সাইলেন্ট করে রেখেছিলাম, পরে আর চেঞ্জ করিনি। ভুলে গেছি।...হ্যাঁ, এই তো। অনেকগুলো মিস্‌ড কল।...স্যরি, স্যরি।...ইস।...আসলে চোখের সামনে স্যরকে মারা যেতে দেখে, আই ওয়জ কমপ্লিটলি আউট অব সেন্স।...মাথা কাজ করছিল না।...'

'হ্যাঁ। আপনি ফোনে ড্রাইভারকে জানাতেই পারতেন।'

'হ্যাঁ, পারতাম। কিন্তু ওই যে বললাম, ডেথ ওয়জ সো শকিং! যে মানুষটার সঙ্গে গত পাঁচ বছর ছায়ার মতো লেগে থেকেছি, যিনি ছেলের মতো ভালোবাসতেন, দু-তিন মিনিটের মধ্যে তিনি আর নেই! উঃ! মাই গড।'

বলতে-বলতে দুহাতে মুখ ঢাকলেন শেরিং।

জগুমামাও একটু ইমোশন্যাল হয়ে পড়েছেন। গাঢ় গলায় বললেন, 'নিজেকে শক্ত করুন মিস্টার শেরিং। নরবু নেই, এটা বাস্তব। তাঁকে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারব না। তবে তার হত্যাকারীকে আমাদের কঠিন শাস্তি দিতে হবে।...পট্টনায়েক, আপনি এখনই সব জায়গায় জানিয়ে দিন।'

'অলরেডি জানিয়ে দিয়েছি। আমাদের অফিসাররা এতক্ষণে ওর বাড়িতে পৌঁছে গেছে।'

'পাঞ্চেনের বাড়িতে কেউ নেই। তালাবন্ধ পাবেন। ওর ওরিজিন্যাল বাড়ি চায়না বর্ডারের ওপারে। ইন্ডিয়ায় ওর কেউ থাকে না। কতবার স্যরকে ওর সম্পর্কে সাবধান করেছি...উঃ।' আবার মুখ ঢাকলেন শেরিং।

৬

চতুর্দিকে পাহাড়ের দুর্গপ্রাচীর। আকাশছোঁয়া পাহাড়েরা নেমে গেছে বহু নীচে পর্যন্ত। ঠিক তার মাঝখানে তাওয়াং। একেক পাহাড়ের একেক রং। ঘন সবুজ, উজ্জ্বল সবুজ, ছায়া পড়ে নীল-সবুজ, একটু কালচে সবুজ। আরও দূরের পাহাড়শ্রেণি ধূসর-নীল। কারও কারও মুকুটে সদ্য পড়া বরফ আইসক্রিমের মতো গড়িয়ে নামছে। পাহাড়ের ফাঁকে-ফাঁকে সূক্ষ্ম সুতোর রেখা। ঝরনা।

আর কোনও শৈলশহরে এ দৃশ্য দেখিনি। তাওয়াং গেস্ট হাউসের ছাদে বসে চোখ জুড়োচ্ছিলাম। ঝকঝকে নীল আকাশ, নরম রোদ্দুর। তবে কতক্ষণ এমন থাকবে, জানি না। একটু আগে আকাশ কালো করে ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছিল।

এই মুহূর্তে কিছু করার নেই। সাতসকালে কর্মা শেরিংকে সঙ্গে নিয়ে জগুমামা, পট্টনায়েক প্রফেসর নরবুর ল্যাবে গেছেন। অনন্তবাবু একমনে ডায়েরিতে কবিতা লিখে যাচ্ছেন।

কাল বিকেলে প্রফেসর নরবুর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। শ'পাঁচেক মানুষ জড়ো হয়েছিলেন প্রফেসরের ল্যাবরেটরির সামনের রাস্তায়। কেউ-কেউ চোখে হাত চাপা দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদছিলেন। মানুষ হিসেবেও নরবু সকলের খুব কাছের ছিলেন। ছুটে এসেছিলেন তাওয়াং মনাস্ট্রির সর্বাধ্যক্ষ গিয়ালসে রিনপোচে। অত্যন্ত সম্মানীত মানুষ। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ সর্বাধ্যক্ষকে সামনে রেখে জানায়, 'আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রফেসর নরবু মারা গেছেন। তাঁর শেষকৃত্য যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হবে। তবে তার আগে আগামী দুদিন ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য দেহ রাখা হবে।'

প্রশ্ন উঠেছিল, 'কেন? মৃত্যু কি অস্বাভাবিক?'

পুলিশ জানায়, 'আপাতদৃষ্টিতে নয়। তবু এই শোকাবহ ঘটনা আকস্মিক ঘটেছে বলে ভিসেরা পরীক্ষা করছি।'

তাওয়াং গেস্ট হাউস খুব সুন্দর। সামনে বাগান। পাইন দেওদার গাছে ভরতি। নিরিবিলি, শহর থেকে একটু দূরে।

তবে আমরা এখন আর একা নই। সাদা পোশাকের সশস্ত্র রক্ষীরা আছে আউটহাউসে। লক্ষ্য রাখছে।

আচ্ছা, সেই ড্রাইভার মদনের কী হল? ওকে কী ডাকাতরা ছেড়েছে, না মেরে ফেলেছে? নাকি ও নিজেই—

ঠং-ঠং! শিকল নাড়াচ্ছে কেউ। চিন্তাসূত্র কেটে গেল। গেস্ট হাউসের কুক-কাম-কেয়ারটেকার ট্রাইবাল মহিলা এসে দাঁড়িয়েছে। কাজ চালানোর গোছের বাংলা-হিন্দি বলতে পারে।

'বলুন।'

'আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে একজন মহিলা এসেছেন।'

'মহিলা! কেন?'

'বলতে পারব না। বলছে, খুব জরুরি দরকার।'

এই রে! কে এল? মামা পট্টনায়েক দুজনের কেউই নেই।

'ড্রইংরুমে বসাও। যাচ্ছি।'

ঠিক তখনই সেলফোন বেজে উঠল। নাম্বার নেই।

'হ্যাঁ মামা। বলো।'

'শোন্, খারাপ খবরটা আগে দিয়ে দিই। ল্যাব বিলকুল ফাঁকা। শুধু অ্যাপারেটাসগুলো পড়ে আছে। মনে হয়, কালকেই সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কর্মাকে ছেড়ে দিলাম। আমরা এখন যাচ্ছি কালকের স্পটে। কাল ভালো করে দেখার কন্ডিশন ছিল না। আমাদের খাবার ঢাকা দিয়ে রাখতে বলিস। খেয়ে নিস। কেমন?'

'সে ঠিক আছে। কিন্তু এদিকে, এইমাত্র একজন মহিলা এসেছে। আমাদের, মানে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। বলছে, খুব জরুরি দরকার। আমি কী করব?'

'কী বলে, শুনে নে। কোনও কমিট করিস না। অ্যাড্রেস নিয়ে নে। এতদিন আমার সঙ্গে আছিস, তোর কাছে এসব কোনও ব্যাপারই নয়।'

'ঠিক আছে। কথা বলছি, যদি অ্যাট অল আমায় বলতে রাজি হয়। তুমি একটা কাজ করো মামা। পট্টনায়েকের নাম্বারটা দিয়ে দাও। যদি কোথাও আটকে যাই—।'

'এই নে, পট্টনায়েকের সঙ্গে কথা বল্।'

*

পাহাড়ি উপজাতিদের বয়েস বোঝা যায় না। মনে হচ্ছে, তিরিশের আশেপাশে। ডিগনিফায়েড চেহারা। চোখে রিমলেস চশমা। পরনে টিপিক্যাল মনপাদের পোশাক। লম্বা গাউন আর শেমিজ। তার উপরে উলের জ্যাকেট। মাথায় রঙিন কাপড় জড়ানো ছিল। এখন খুলে গলায় ঝুলিয়েছেন। চোখেমুখে বিষাদ আর ভয়।

ভদ্রমহিলাও আমায় খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

'বলুন।'

'আপনি...?'

'আমি ডক্টর জে বি মুখার্জির ভাগ্নে। অর্ণব ভট্টাচার্য। ওনার অ্যাসিস্ট্যান্টও বলতে পারেন। ডক্টর মুখার্জি বাইরে বেরিয়েছেন। এইমাত্র ফোনে বললেন, ফিরতে দেরি হবে। আমায় শুনে নিতে বললেন।'

'মা...মানে...ব্যাপারটা...'

'খুব কনফিডেশিয়াল, তাই তো? আপনি নিশ্চিন্তে বলতে পারেন।'

ভদ্রমহিলা খোলা দরজার দিকে তাকালেন। উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

'আসলে চারিদিকে রাম অবতারের লোক...আমি মুখ ঢেকে এসেছি।'

'রাম অবতার? কে সে?'

'বলছি। তার আগে...এইটা, এইটা একটু সরিয়ে রাখুন।'

বড় ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কাগজে মোড়া একটা গাছের টুকরো বের করে এগিয়ে দিলেন। বড়-বড় সবুজ পাতা, ডালের বোঁটায় উজ্জ্বল লাল ফুল। লালের মধ্যে বেগুনির ছিটে।

'আমার নাম পেমা। পেমা নোরগে। এখানকার একটা বাচ্চাদের স্কুলে আমি পড়াই। প্রোফেসর নরবু সম্পর্কে আমার দাদা হতেন। শুধু সম্পর্কের জন্যে নয়, নরবু ভাইয়া ছোটবেলা থেকেই আমায় খুব ভালোবাসতেন। ওনার উৎসাহেই আমি বোটানি নিয়ে লেখাপড়া করেছি। গৌহাটি য়ুনিভার্সিটি থেকে এম. এসসি করেছি। ইচ্ছে ছিল

রিসার্চ করার। বাবা-মা-র চাপে হয়নি। বিয়ে করতে হয়েছে। তারপর সংসার...বাচ্চা সামলে...'

'আপনার হাজব্যান্ড?'

'আর্মি ডক্টর। এখন তাওয়াং-এ পোস্টেড। সে যাক্, যেটা বলছিলাম, দাদার জন্যেই গাছ-গাছড়ার উপর আমার এখনও খুব কৌতূহল। ফাঁক পেলেই দাদা আমার কাছে যেতেন। রিসার্চ নিয়ে ডিসকাস করতেন।'

'উনি কি এই গাছটা নিয়েই রিসার্চ করছিলেন?'

'আমার তাই মনে হয়। পরশু রাতে ডিনারে এসেছিলেন। হাতে এই গাছটা। বললেন, রেখে দে। এই গাছের যে কী সাংঘাতিক ক্ষমতা, কেউ জানে না! দু-একদিনের মধ্যে ফাইন্যাল অবজারভেশন পেয়ে যাব।'

'আচ্ছা! কী নাম এর?'

'লোকালি বলে জিনসেং। দাদা বললেন, বোটানিক্যাল নাম প্যানাক্স সিউডোজিনসেঙ। এর শিকড় থেকে মেডিসিন তৈরি হয়। তবে পার্টিকিউলার এই ভ্যারাইটিটা, অন্য স্পিসিস থেকে আলাদা। এর শিকড়ে এমন সব দ্রব্যগুণ আছে, যেটা পৃথিবীর মেডিসিন জগতে রেভোলিউশন আনবে।'

'রিয়্যালি! তারপর?'

'আমি দাদাকে বললাম, তুমি যদি রিসার্চ কনটিনিউ করতে চাও, এখান থেকে চলে যাও। তুমি টার্গেট হয়ে গেছ। তাই জন্যেই তোমার কাছ থেকে ভালো টাকা পাওয়া সত্ত্বেও প্ল্যান্ট কালেকটররা আর আসছে না। গা ঢাকা দিয়েছে।'

'গা ঢাকা দিয়েছে? আমরা যে শুনলাম, খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না!'

'একই কথা। ওরা সব জঙ্গলের পাশের গ্রামগুলো থেকে গাছ-গাছড়া নিয়ে আসত। হঠাৎ চার-পাঁচদিন আগে থেকে সব ডুব। কাউকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই কেউ বা কারা ওদের থ্রেট করেছে! নাহলে সবাই একসঙ্গে নিখোঁজ হয়?'

'রাইট। দাদা কী বললেন?'

'দাদা বললেন, ঠিকই বলেছিস। তারপর বললেন ডক্টর মুখার্জির

কথা। ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে দিল্লিতে। ওনারা আসছেন।...কিন্তু এসে কোনও লাভ হল না।'

পেমার কথা আবেগে আটকে গেল। হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ দরজায় টোকা মারল। পেমা কেঁপে গেলেন।

'কে?' উঠে গিয়ে দরজা ফাঁক করলাম।

অনন্তবাবু।

'প্লিজ, জরুরি কথা বলছি। একটু পরে।' দরজা বন্ধ করে এসে বললাম, 'আপনার কি মনে হয়, নরবুকে মার্ডার করা হয়েছে?'

পেমা ঘাড় নাড়লেন।

'কিন্তু অ্যাপারেন্টলি ডেথ ওয়জ নরম্যাল। হার্ট অ্যাটাক। যদিও শেরিং বলল, পাঞ্চেন একট ওষুধ দিয়েছে। তারপরেই অ্যাটাক হয়েছে। আজ বিকেলে ভিসেরা রিপোর্ট পাওয়ার কথা। তারপর ক্লিয়ার হবে।...হ্যাঁ, আপনি ঢুকেই রাম অবতার বলে কারও কথা বলছিলেন। কে সে?'

'মেডিসিন্যাল হার্বসের ব্যবসা করে। লাইসেন্স আছে। লোকজন দিয়ে জঙ্গল থেকে হার্বস কালেক্ট করে। কলকাতা, দিল্লি, বোম্বে আয়ুর্বেদিক ওষুধ কোম্পানিগুলোকে সাপ্লাই করে। কোটিপতি লোক। কিন্তু—'

পেমা থেমে গেলেন।

'কিন্তু—?'

'কিন্তু আসলে ও একটা পাক্কা মাফিয়া। গাছ-গাছড়া, শুধু নয়, সেইসঙ্গে কীটপতঙ্গ, যেমন সাপ, বিছে, গিরগিটি, প্রজাপতি, পাখি, জন্তুদের দাঁত, চামড়া সব বেআইনিভাবে পাচার করে। সরকারের লোকজনকে ঘুষ দেয়। মুখ বন্ধ। কেউ ঘাঁটায় না।'

'পাচার করে? কোথায়?'

'বর্ডারের ওপারে। কতটুকু দূর টিবেট-চায়না বর্ডার? মাধুরী লেক থেকে তিন-চার কিলোমিটার। জঙ্গল-পাহাড়। কোনও বর্ডার আছে নাকি? ওপারের লোকেরা রোজ এপারে আসছে। এপারের লোকরা ওপারে যাচ্ছে। কোনও ব্যাপার নয়।'

'বলেন কী? রাম অবতার কি লোকাল লোক? আপনাদের সেম ট্রাইব?'

'না-না। মনপা ট্রাইব নয়। বলে তো অরুণাচলী। অনেকগুলো ভাষাও জানে। বহুবছর তাওয়াং-এ আছে। চকমেলানো ফাইভ-স্টার বাড়ি। চারটে গাড়ি। টাইটেল সিং। শুনে মনে হয়, অ্যাসামিজ বা নেপালি।'

'রাম অবতারের সঙ্গে কি প্রোফেসর নরবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট কর্মা শেরিং বা পাঞ্চেন গোম্বুর যোগাযোগ ছিল?'

'জানি না। কাউকেই বিশ্বাস করি না।'

'হুঁ। রাম অবতারের এইসব স্টক রাখার গোডাউন কোথায়? নিশ্চয়ই বাড়িতে নয়?'

'বাড়িতে একটা আছে। সেটায় দু-নম্বরি কিছু থাকে না। আসল গোডাউন 'ভউ' গ্রামে। জঙ্গলের মধ্যে। তাওয়াং থেকে নেমে জং ফল্‌স-এর রাস্তায় যেতে পড়বে। শুনেছি, জঙ্গলের ভিতর লরি যাওয়ার রাস্তা ও বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আমি জানি না, সেখানে পৌঁছতে পারবেন কিনা। লোকাল লোক বলবে কিনা। কারণ সবাই ওর র‍্যাকেটে ইনভলড।'

'আপনি জানলেন কী করে?'

এতক্ষণে পেমার মুখে একচিলতে হাসি ফুটল।

'অর্ণববাবু, পাপ কখনও চাপা থাকে না। রাম অবতারের ছোট ছেলে আমাদের স্কুলে পড়ে। আমার কাছে প্রাইভেট টিউশন নেয়। তাকে একদিন পড়াতে-পড়াতে কোনও প্রসঙ্গে বলেছিলাম, তোমার বাবার এত টাকা! এইসব গাছ থেকে এত টাকা হয়? ছোট ছেলে, সরল। বলল, আন্টি, বাবার আরেকটা অনেক বড় গোডাউন আছে। জঙ্গলে। সেখানে গাছ শুধু নয়, চিড়িয়াখানা আছে। মরা জন্তু, জ্যান্ত সাপ-টাপ সব আছে। আমি বাবার সঙ্গে একদিন গেছি। তোমাকেও নিয়ে যাব।'

স্তম্ভিত হয়ে বসে আছি। ভয়ঙ্কর সব ইনফরমেশন দিলেন পেমা। নরবুর মৃত্যুর সঙ্গে এর কি কোনও সম্পর্ক আছে? পাঞ্চেন কি ওই জঙ্গলের গোডাউনেই লুকিয়ে আছে?

পেমা উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, 'চলি। আমি সিওর, রাম অবতার সিং-ই থ্রেট করেছে দাদার প্ল্যান্ট কালেক্টরদের। হয়তো... হয়তো...দাদার

মৃত্যুর জন্য ও-ই দায়ী। কীভাবে, জানি না। প্লিজ, দেখবেন যেন কোনওভাবে লিক না হয় এসব কথা। আমার বাচ্চাটা খুব ছোট, একবছরের।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ম্যাডাম। একমিনিট। আপনার কনট্যাক্ট নাম্বার আর অ্যাড্রেসটা যদি দেন। মামা গোপনে যোগাযোগ করে নেবেন।'

পেমা ব্যাগ থেকে কাগজ বের করে লিখে দিলেন। তারপর মুখে কাপড় জড়ালেন। নিজেই দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে গেলেন।

বিহ্বল হয়ে কয়েকমুহূর্ত কেটে গেল। গাছটা দেখছি। শিকড় নেই। মাটির ওপরের খানিকটা অংশ।

সামলে নিয়ে পট্টনায়েকের নাম্বারে ফোন করলাম। মামাই ফোন ধরলেন।

'হ্যালো, মামা! মহিলা সাংঘাতিক সব ইনফর্মেশন দিলেন। মনে হয়, কাজে লাগবে। তোমরা কোথায়?'

'এখনও জঙ্গলে। ঝরনার ধারে। এখনও খুঁজছি।'

'পাওনি কিছু?'

'পেয়েছি! পেয়েছি রে! জানিস, কী-কী পেয়েছি?'

'কী?'

'একটা ভোজালি। জঙ্গলের মধ্যে পড়ে ছিল!'

'ভোজালি! কাল কোনও রক্তপাত—'

'আরে, তাই তো! কী মিস্টিরিয়াস ব্যাপার! ভোজালি কেন? আর কী পেয়েছি জানিস? পেয়েছি একটা ব্যাগ। নরবুর ব্যাগটা কাল প্রায় খালিই ছিল। আর এই ব্যাগটা বোঝাই কাগজপত্র। উলটেপালটে যেটুকু বুঝেছি, রিসার্চের পেপারস।'

'জানো, যে গাছ নিয়ে নরবু রিসার্চ করছিলেন, সেই গাছটা মহিলা দিয়ে গেছেন। বোটানিক্যাল নেম নোট করে নিয়েছি।'

'গুড! সব সাবধানে রাখ। এবার শোন, আর কী পেয়েছি। যেখানে নরবুর বডি পড়ে ছিল, তার একটু দূরে পাথুরে জলাজমিতে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ।'

'সিরিঞ্জ!'

'হ্যাঁ। অ্যামপুলও নিশ্চয়ই পাব। খুঁজছি। ফোর্স আছে। ওরাও খুঁজছে।...ওয়েট কর। ফিরে একসঙ্গে কথা হবে।'

৭

জিপের হেডলাইট নিভিয়ে দিতেই মিশমিশে অন্ধকার।

বিক্রম পচনন্দা বললেন, 'স্যর, আমাদের এখানে নামতে হবে।'

'এখান থেকে কতটা বিক্রম?'

'তা খানিকটা স্যর। মিনিট পাঁচেক নামলে ভউ গ্রাম। তারপর জঙ্গলের মধ্যে প্রায় হাফ কিলোমিটার।'

'হাফ কিলোমিটার! বাপ্‌রে! কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না।'

'আপনাকে আসতে মানা করেছিলাম অনন্তবাবু। শুনলেন না। আপনি গাড়িতেই থেকে যান।'

'গাড়িতে? একা? প্রশ্নই ওঠে না।'

'কেন? কাচ তুলে লক করে বসে থাকবেন।'

'লক তুললে কি তেনাদের আটকানো যায় নাকি? একা থাকি, আর তেনারা এসে ধরুক আর কি! উরিব্বাপ! না স্যার, চলুন। জন্মিলে মরিতে হবে, মরাবাঁচা কে কবে—।'

লম্বা-লম্বা টর্চ জ্বলল। উপরে কালো শেড লাগানো। আলো পড়ছে কেবল জমিতে। মাঝে আমরা, দুপাশে ফৌজিরা, যাত্রা শুরু হল।

প্রত্যেকের পায়ে কেডস বা স্নিকার স্যু। তবু হালকা শব্দ উঠছে। শব্দহীন চরাচর।

কালকে বসে আজকের প্ল্যান করা হয়েছিল। আজ খুব ভোরে আর্মির ইনফরমাররা এসে গোপনে জায়গাটা দেখে গেছে। পেমার কথাগুলো সব সত্যি। জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা এবং শেষে জঙ্গলের গাছপালায় ঢাকা রাম অবতার সিংয়ের 'চিড়িয়াখানা' আছে।

আজ সকাল থেকে ঝরনার পাশের স্পট থেকে পাওয়া কাগজপত্র

এবং ভোজালি ও সিরিঞ্জ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন জগুমামা। কোনও অ্যাম্পুল পাওয়া যায়নি। মামার বক্তব্য, ক্রিমিন্যাল হয় ভেঙে ফেলেছিল বা জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। তবে সকাল দশটা নাগাদ সিরিঞ্জ এবং পেমার দেওয়া গাছ নিয়ে একজন সিকিওরিটি অফিসার হেলিকপ্টারে গুয়াহাটি রওনা হয়ে গেছেন। গাছটা নিয়ে যাবে য়ুনিভার্সিটির বটানি ডিপার্টমেন্টে। সিরিঞ্জটা দেওয়া হবে আর্মি হসপিটালে। মামা কথা বলে নিয়েছেন। কাল সকালে, বড়জোর দুপুরের মধ্যে রেজাল্ট জানা যাবে।

দুপুরের দিকে পট্টনায়েককে নিয়ে মামা বেরিয়েছিলেন। তার আগে আমার কাছ থেকে নাম্বার নিয়ে পেমাকে ফোন করেছিলেন। কী কথা হয়েছিল, কোথায়-কোথায় গেছিলেন, জানি না।

পিট-পিট করে বৃষ্টি শুরু হল। কনকনে ঠান্ডা। কেঁপে উঠছি। অনন্ত সরখেল বারদুয়েক অস্ফুট শব্দ করলেন।

কিন্তু থামার কোনও উপায় নেই। বরং হাঁটার গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ফৌজিরা। ভউ গ্রামের দু-চারটে কুঠিবাড়ি পেরিয়ে ডানদিকে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

অন্ধকারের মধ্যে ফোঁটা-ফোঁটা আলোর মালা দুলতে-দুলতে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার সামনে জগুমামা, তার ঠিক আগে সত্যসাধন পট্টনায়েক। গায়ে গা ঘেঁষে কাঁপতে-কাঁপতে আসছেন অনন্ত সরখেল।

'মামা, একটা কথা জিগ্যেস করব?'

'কর। কিন্তু একেবারে লো-ভল্যুম।'

'ঠিক আছে। আচ্ছা, মদন তামাংয়ের খবর কী? পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ। অ্যারেস্টেড।'

'অ্যারেস্টেড?'

'হ্যাঁ। গাড়ির কিছুই হয়নি। ব্ল্যাটেনড লাই। ডাকাতের গ্যাংয়ের সঙ্গে ইনভলব্‌ড ছিল।'

'কিন্তু ওকে তো সিকিওরিটি অফিস থেকেই পাঠানো হয়েছিল।'

'হয়েছিল। তারপরে বিশাল টাকার অফার পায়। কারা দিয়েছিল, এখনও অব্দি স্বীকার করেনি। তবে কড়া ডোজ পড়লেই করবে। এসটিডি বুথ থেকে তারাই ফোন করছিল। তোর নাম্বারও মদন তাদের

দিয়েছিল। অরুণাচল জুড়ে মাফিয়ারা প্যারালাল অ্যাডমিন্‌সট্রেশন চালাচ্ছে।...চাকুতে ফিরে গিয়ে মদন ডাকাতদের পাঠিয়ে দেয়। আমার স্যাটেলাইট ফোনটা সেদিন না থাকলে মৃত্যু অবধারিত ছিল। ওদের 'কাঁটা' তাওয়াং পৌঁছোনোর আগেই পরিষ্কার হয়ে যেত।'

বৃষ্টি কমে গেছে। বরফঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। ভিজে জ্যাকেট। খোলার উপায় নেই।

জঙ্গলের মধ্যে আবার থোকা-থোকা জোনাকি উড়ছে। মাঝে-মাঝে ঝোপের মধ্যে সবুজ-সবুজ চোখ জ্বলছে-নিভছে। তারপরেই খড়মড় শব্দ। জন্তুগুলো পালাচ্ছে। 'ফ্যা-র্‌-র্‌' শব্দ হল একবার। নিশ্চয়ই বড়জাতের চতুস্পদ! তাদের রাজ্যে রবাহুত অতিথিদের ইনি মোটেই পছন্দ করছেন না।

'স্যার। আমরা এসে গেছি।'

পুরো দল দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিছুটা দূরে গাছপালার আড়ালে কয়েকটা টিনের চালের বাড়ির কাঠামো দেখা যাচ্ছে। বাঁশের বাউন্ডারি। বেশ বড় চৌহদ্দি।

কোথাও কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। ক্ষীণ তারার আলো মেখে ভূতের মতো বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। 'কাকাবাবুর' একটা অ্যাডভেঞ্চার পড়েছিলাম। জঙ্গলের মধ্যে পোড়ো বাড়ি। ঠিক তেমন লাগছে।

মামা কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর বললেন, 'বিক্রম, তোমাদের দু-তিনজন আগে গিয়ে দেখে আসুক। তারপর ডিসিশন নেব।'

বলার অপেক্ষা! গুঁড়ি মেরে দ্রুত এগিয়ে গেল কয়েকজন জওয়ান। মিনিট দুয়েকের মধ্যে ফিরে এল।

ওদের লিডার ক্যাপ্টেন জয়বাহাদুর ছেত্রী। আমাদের পরিচিত। বলল, 'সাব, অন্দরমে আদমি হ্যায়। বাত চল রহা হ্যায়।'

'চলুন।' মামার সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও এগিয়ে গেলাম।

ফেন্সিং-এর মাঝামাঝি জায়গায় একটা গ্রিলের গেট। ভিতর থেকে তালাবন্ধ। ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে অবাক হয়ে গেছি। ভিতরে বিরাট এলাকা। পরপর টিনের কুঠুরি। একটা বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে একটা পুকুর। জলের ওপর তারার আলো কাঁপছে।

প্রথম দোচালা বাড়ির ভেতর থেকে আলোর আভা বেরুচ্ছে। জানলা বন্ধ। তবু কথা শোনা যাচ্ছে। দুজন হিন্দিতে কথা বলছে। পুরুষকণ্ঠ জোরে-জোরে ধমকাচ্ছে। মহিলাটি কাকুতিমিনতি করছে। মহিলা আমাদের পরিচিত!

'দ্যাখো পেমা, আমি কিন্তু ধৈর্য হারিয়ে ফেলছি। কী কথা হল। চটপট বলে ফ্যালো।'

'সার, বিশ্বাস করুন, আমি কিছুই জানি না।'

'জানি না? তুমি যাওনি ওই লোকটার কাছে? আমার আদমি নিজের চোখে দেখেছে তোমায় গেস্ট হাউসে ঢুকতে।'

'গিয়েছিলাম সার। কিন্তু উনি ছিলেন না। দেখা হয়নি।'

'কেন গিয়েছিলে?

'সার, আলাপ করতে। ওনার নাম শুনেছিলাম আগে, তাই।'

'ফের ঝুট বাত! ওই ঝুড়িটা দেখছ? হিস্‌হিস্‌ শব্দ পাচ্ছ? আমি দরজায় শিকল তুলে বেরিয়ে যাব। তার আগে ঝুড়ির ঢাকাটা তুলে দিয়ে যাব। তারপর কী হবে, বুঝতে পারছ?'

'সার প্লিজ। বিশ্বাস করুন, আমি বটানি পড়েছিলাম। নরবুভাইয়াকে খুব ভালোবাসতাম। ওনার ডেথে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। তাই ওদের দুঃখের কথা বলতে গেছিলাম।'

'আহা! দুঃখের কথা বলতে গেছিলে! আর খুনটা যে তোমার লোকেই করেছে, সেটা বলোনি?'

'কী বলছেন স্যার?'

'ঠিকই বলছি পেমা। যাতে ওই তদন্তের ফোকাস অন্যদিকে ঘুরে যায়। আমায় ওরা সন্দেহ করে। সেজন্যেই গেছিলে!'

'না সার! আপনি ভুল করছেন। নরবুভাইয়া মারা যেতে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি। কতদিন ধরে কত কষ্ট করে রিসার্চ করছিলেন। উনি আমার বাড়ি যেতেন। দেখাতেন গাছপালা।'

'ভুল করেছিল। সে বোঝেনি, তুমি খুনিদের সঙ্গে রয়েছ। শোনো পেমা, তোমায় সাচ বলার লাস্ট চান্স দিচ্ছি। নইলে এই জঙ্গলে কেউটের ছোবল খেয়ে তোমার ডেডবডি পড়ে থাকবে।'

'সার, আমি...আমি আপনার ছেলেকে পড়াই। ভাবি আমায় বোনের মতো ভালোবাসেন। বিশ্বাস করুন—'

'চুপ! শাট আপ! ঝুটি কাহিকা! ওই বাচ্চা ছেলেকে পটিয়েই তো তুমি আমার এই গোডাউনের কথা জেনেছ! আমার লোক তোমায় যখন দেখল গেস্ট হাউসে, আমায় ইমিডিয়েট ইনফর্ম করল। সন্দেহ হল আমার। আমার নিজস্ব রিপোর্ট বলেছে, তুমি খুনের সঙ্গে জড়িত। আজ ছেলের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে সে বলল, তোমায় আমার এই ডেরার কথা সে-ই বলেছে! বলো! কী-কী বলেছ ওদের? আজ তোমায় ছাড়ছি না! টাইম বহোৎ শার্ট। কুইক!'

এর পরেই কিছু একটা ঘটতে চলেছে। পট্টনায়েক উসখুস করছেন। ফোর্স রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মামা ইশারায় শান্ত হতে বললেন।

'সার, একটা কথা বলব?'

'বলে ফেলো!'

'আপনার সঙ্গে ওদের কোনও কনট্যাক্ট ছিল না?'

'কাদের? খুনিদের? নাঃ। শুনে রাখো, নরবু যেটা করছিল, তাতে আমার বিজনেসের ক্ষতি হচ্ছিল। প্ল্যান্ট কালেকটরদের বেশি পেমেন্ট করে তুলে নিচ্ছিল। গাছ তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি বিজনেসম্যান! তাই ট্রাইবালদের আমি টাকা দিয়েছি, হুমকি দিয়েছি। ওরা আর নরবুর কাজে যায়নি। দিস মাচ। কিন্তু তুমি খুব ভালো করে জান, নরবু খুন হয়েছে কেন? জান না?'

পেমা চুপ।

'নাহ্। অনেক বোঝালাম। তুমি বোঝার বান্দা নও। থাকো তুমি। একা-একা! সাপগুলোর সঙ্গে। আমি যাচ্ছি। না-না, ঝুড়িগুলো আজ খুলছি না। কাল ভাবব। আমি দেখতে চাই, তোমার সঙ্গীরা তোমার খোঁজ পায় কিনা। বাঁচাতে আসে কিনা।'

'সার। আই বেগ য়োর মার্সি!

'মার্সি? তোমাকে? হাঃ হাঃ! চললাম।'

দরজা খোলার শব্দ হল। তারপর বাইরে শিকল টানা হল।

পিছন থেকে পেমার কাতর গলা শোনা যাচ্ছে, 'সার! মরে যাব সার! খুলে দিন সার।'

এই সময় একটা কাণ্ড হল! রাম অবতার গটমট করে বেরিয়ে জিপে উঠতে যাচ্ছে। অন্ধকার ফুঁড়ে চৌহদ্দির ভিতরের জঙ্গল থেকে দুটো লোক বেরিয়ে এসে ফটক খুলে দিচ্ছে। আমরা দ্রুত আড়ালে সরে যাচ্ছি।

সড়াৎ—! পিছল জমিতে ধড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়লেন অনন্ত সরখেল। নৈঃশব্দ্যের মাঝে শব্দটা চতুর্দিক কাঁপিয়ে দিল।

মুহূর্তের মধ্যে রাম অবতার চলে এসেছে গেটের কাছে।

'বাঃ! বাঃ। আপনারা সব চলে এসেছেন! গুড। আমায় অ্যারেস্ট করবেন তো?'

অনন্তবাবু কাতরাচ্ছেন। বুড়োটার হাড়-টাড় ভাঙল কিনা, কে জানে! মামা দ্রুত নিজেকে সামলে নিচ্ছেন।

'নমস্কার মিস্টার সিং। আমি জগবন্ধু মুখার্জি।'

'চিনি, চিনি। পরিচয় দিতে হবে না। বলুন, কী চান?'

'কথা বলতে চাই।'

'সে তো আমার অফিস-বাড়িতে গিয়ে হতে পারত। এখানে এত রাতে আসার দরকার ছিল না।'

মামা পাঁচ সেকেন্ড সময় নিলেন।

'আমরা শুনেছি, এখানে আপনি বে-আইনি—'

'সব মাল পাচার করি, তাই তো? শুনুন মুখার্জিসাব, এই গোডাউনের সব কাগজপত্র, লাইসেন্স আমার আছে। গভর্মেন্টের কাছ থেকে জমি কিনেছি। মেডিসিন্যাল প্ল্যান্ট কালেক্ট করে এখানে স্টোর করি। তারপর ওষুধ কোম্পানিগুলোতে সাপ্লাই করি।'

'আর সাপ?' জন্তু-জানোয়ারের চামড়া-হাড়?'

কঠিন চোখে একসেকেন্ড তাকাল রাম অবতার। তারপর নিস্তব্ধ জঙ্গল কাঁপিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল। গাছে-গাছে কয়েকটা পাখি ঝটপট করে উঠল। আমরা স্তম্ভিত।

'হাসছেন?'

'হাসব না? আসুন, ভিতরে আসুন। একটাও অ্যানিমাল দেখাতে পারবেন? সব ঘরগুলো খুলে দিচ্ছি। আসুন। আর সাপ? ইয়েস। সাপ

ধরার লাইসেন্স আমার নেওয়া আছে। ভেনাম কালেকট করি। তারপর ড্রাগ কোম্পানিতে সাপ্লাই করা হয়। এজন্যে রীতিমতো ট্যাক্স দিই গভর্মেন্টকে।'

'তার মানে সবকিছুই আপনি আইন মেনে করেন, তাই বলতে চাইছেন তো?'

'কিছুই বলতে চাইনি। সবকিছু আইন মেনে করলে তো মোশাই, নেংটি পরে হিমালয়ে চলে যেতাম। কিন্তু মুশকিল কি জানেন, বে-আইনি কিছু প্রুফ করতে পারবেন না! আমার স্টকের কাগজপত্র, অ্যাকাউন্টস সব কম্পিউটারে তৈরি হয়।'

আবার সশব্দে হেসে উঠল লোকটা।

মামা ঠান্ডা গলায় বললেন, 'কিন্তু আমাদের কাছে যে ডেফিনিট ইনফর্মেশন আছে, আপনি এই কালেকশনের মেজর শেয়ার ইল্লিগ্যালি টিবেটে, মানে চায়নায় পাচার করেন।'

'বাঃ! পেমা আপনাকে অনেক কিছু জানিয়েছে। না, কিছুই বলব না। যা পারেন প্রমাণ করুন।'

'হ্যাঁ। ধরে নিন, পেমাই সব জানিয়েছে। তাই ওকে আটকে রেখেছেন!'

'ওয়ান্ডারফুল! তাহলে আপনারা সবটাই শুনেছেন। ওকে ছেড়ে দিতে বলছেন?'

'হ্যাঁ। এখনই। নইলে একজন মহিলাকে অ্যারেস্ট করার অভিযোগে আপনাকে অ্যারেস্ট করব।'

'কোনও জরুরত নেই। এখনই ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু...আমার নিজস্ব সোর্স বলছে, পেমা—'

'শুনেছি। উই'ল টেক কেয়ার অফ দ্যাট। শি উইল বি ইন আওয়ার কাস্টডি।'

'ইটস ওকে। আদারওয়াইজ শি উইল বি মার্ডারড।'

'তার মানে আপনি এও জানেন, প্রোফেসর নরবুর খুনি কে?'

'জানি, আবার জানি না।'

'কেন?'

'কারণ কোনও প্রুফ নেই।'

'কেন? কর্মা শেরিং আই উইটনেস দিয়েছে, নরবুর অ্যানাদার অ্যাসিস্ট্যান্ট পাঞ্চেন গোমবু তাঁকে খুন করে পালিয়েছে?'

'তবে তো সব ঠিকই আছে। পাঞ্চেনকে অ্যারেস্ট করুন।'

'কিন্তু কোথায় সে? কোনওভাবে চায়নায় পালিয়ে গেলে আর ধরতে পারব না। অবশ্য মনে হয়, সেই সময় সে পায়নি। অরুণচলের সব বর্ডারে, থানায়, চেক পোস্টে তুরন্ত্ ছবি দিয়ে মেসেজ গেছে। কিন্তু তবুও তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। আপনার নিজস্ব নেটওয়ার্ক কিছু বলছে কি রাম অবতারজি? আপনি কি আমাদের হেল্প করতে পারেন?'

রাম অবতার স্থিরচোখে তাকিয়ে রইল জগুমামার দিকে। তারপর আবার হেসে উঠল।

'আপনি অনেক ইন্টেলিজেন্ট পার্সন ডক্টর মুখার্জি। খোঁজ করুন। ঠিক পেয়ে যাবেন। নিশ্চয়ই জানেন, ক্রিমিন্যালরা যখন এলাকা ছেড়ে পালাতে পারে না, তখন কোন কোন জায়গায় শেল্টার নেয়?'

'জানি। খারাপ এলাকায় বা অন্য ক্রিমিন্যালের ডেরায়।'

'আর—আর? পাঞ্জাবে খালিস্তানিদের ধরতে গভমেন্ট কোথায় ফাইন্যাল অপারেশন করেছিল?'

মামা নিঃশব্দ।

'ডক্টর মুখার্জি, এবার তাহলে যেতে পারি? আপনারা আমায় অ্যারেস্ট করছেন না, তাই তো? ওই যে পেমা আসছে। ওকেও নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নিন।...ড্রাইভার, গাড়ি নিকালো।

জিপে উঠে বসলেন। অন্ধকার পাতলা হয়ে গেছে। দু-একটা পাখি ডাকছে। জিপ ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

৮

গেস্ট হাউস থেকে বেশ কিছুটা ঢালু পথে নামা। তারপর আবার পাকদণ্ডী বেয়ে পাহাড় টপকে-টপকে ওপরে ওঠা।

সম্পূর্ণ আলাদা একটা পাহাড়ের মাথায় তাওয়াং মনাস্ট্রি। অন্য

পাহাড়ের চেয়ে উঁচুতে। মূল তোরণের সামনে এসে জিপ থামল। বাইরে বেরিয়ে অবাক হয়ে গেলাম।

বাঁদিকে নীচের পাহাড়ে তাওয়াং শহর। পরপর পাহাড়ের ঢেউ। ডানদিকে তাওয়াং মনাস্ট্রির বর্ণময় ক্যাম্পাস। কী বিশাল! প্রার্থনা মন্দিরের চুড়োয় সোনার রং ঝলসাচ্ছে। তার চারিপাশে একের পর এক তিব্বতি স্থাপত্যের দোতলা-তিনতলা বাড়ি।

'ভেতরে যাওয়া যাক। পৌনে তিনটে বাজে।'

'স্যার! এ তো আস্ত একটা শহর।'

'শহরই তো। তিব্বত বাদ দিলে এশিয়ার বৃহত্তম মনাস্ট্রি। সারা পৃথিবী থেকে বুদ্ধপূর্ণিমার দিন বৌদ্ধরা আসেন। নাচগান হয় সারারাত ধরে।'

'তাওয়াং শহরেরও আগে এই মনাস্ট্রি, তাই না মামা?'

'অনেক আগে। এই মনাস্ট্রি থেকেই শহরের নাম। তিব্বতি ভাষায় 'তা' মানে ঘোড়া, 'ওয়াং' মানে পছন্দ। মেরাক লামা নামে এক সন্ন্যাসী নাকি মনাস্ট্রি তৈরির জায়গা খুঁজছিলেন। পাহাড়ের গুহায় গিয়ে বুদ্ধর উপাসনা করছিলেন। বেরিয়ে দেখেন, ঘোড়াটা নেই। কোথায় গেল? খুঁজতে-খুঁজতে দেখা গেল, অনেক উঁচুতে একটা পাহাড়ের মাথায় ঘোড়াটা শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মেরাক লামার বিশ্বাস জন্মাল, ভগবান বুদ্ধ ওখানেই মনাস্ট্রি চাইছেন। মনাস্ট্রির কাজ কবে শুরু হল জানিস? ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে।'

'বাব্বা! এত পুরোনো!'

'হ্যাঁ। এই মনাস্ট্রির দখল নিয়ে চিন, ভূটান, তিব্বতের রাজাদের মধ্যে কতবার যুদ্ধ হয়েছে। যুগ-যুগ ধরে। ১৯৬২-তে চিনারা প্রায় ছ'মাস দখল করে রেখেছিল। কত যে সোনাদানা আছে এদের, ইয়ত্তা নেই।'

বাঁ-দিকে মস্তবড় মন্দির। বড়-বড় খিলান। তিব্বতি স্থাপত্য। সোনালি মাথায় রঙিন পতাকা উড়ছে। ডানদিকে, সামনে বড়-বড় অট্টালিকা। বাঁধানো চাতালে বসে আশ্রমের শিশু-কিশোররা লেখাপড়া করছে। মাঝখানের পথ দিয়ে হাঁটছি। প্রচুর টুরিস্ট ঘোরাফেরা করছেন।

সর্বাধ্যক্ষের ভবনে পৌঁছোতে-পৌঁছোতে আরও পাঁচমিনিট। বাইরে যে তরুণ শ্রমণ বসে আছেন, তাঁকে মামা হিন্দিতে আমাদের পরিচয় দিলেন। সে বিনীতভাবে বলল, সর্বাধ্যক্ষ রিনপোচে তাকে আমাদের কথা বলেছেন। আমরা যেন মন্দিরে চলে যাই। এখনই প্রার্থনা শুরু হবে। সর্বাধ্যক্ষ প্রার্থনাসভায় আমাদের থাকার বিশেষ অনুমতি মঞ্জুর করেছেন। ওখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

ঢং-ঢং-ঢং! ঘণ্টাধ্বনি শুরু হয়ে গেছে। নানা বাড়ি থেকে দলে-দলে লামা সন্ন্যাসীরা বেরিয়ে যাচ্ছেন। আমরাও ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটছি।

বিশাল হলঘর। একেবারে শেষপ্রান্তে প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু সোনার বুদ্ধমূর্তি। তার পাশে উত্তরের দেওয়ালে 'দ্রি দেবীর' কাপড়ে আঁকা ছবি। মহাযানপন্থী তিব্বতি বৌদ্ধদের 'দ্রোই মা'।

দেখতে-দেখতে হলঘর ভরে যাচ্ছে। জগুমামা, আমি এবং পট্টনায়েক থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছি। অনায়াসে এই হলঘরে পাঁচশো মানুষ জড়ো হতে পারেন।

সার দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে লামারা বসছেন। সামনে একটু উঁচু ডেস্ক। ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। মাঝখান দিয়ে এক প্রধান লামা, চোখে চশমা, হেঁটে-হেঁটে বুদ্ধমূর্তির পদপ্রান্তে কাঠের আসনে গিয়ে বসলেন।

প্রার্থনা মন্ত্রপাঠ শুরু হল, 'ওম মণি পদ্মে হুম্...'।

একবর্ণ ভাষা বুঝছি না। শুধু বারেবারে সম্মিলিতকণ্ঠে সকলে বলে উঠছে ঃ '...পদ্মে হুম্।'

মামা নিবিষ্টমনে দেখছেন, শুনছেন। ভাবগম্ভীর পরিবেশ। অগুরু, আর ধূপের কড়া সুগন্ধ। মূর্তির সামনে নানারকমের ফল, চাল, গম ইত্যাদি পুজোর দ্রব্য নিবেদিত।

সব ভিক্ষু বা লামাদেরই একই বসন। গাঢ় মেরুন রঙের কাপড় বিশেষ কায়দায় সর্বাঙ্গ জড়ানো। ঊর্ধ্বাঙ্গে ওই রঙেরই ছোট জামা। একমাত্র সর্বাধ্যক্ষ রিনপোচের জামার রং কমলা।

সর্বাধ্যক্ষ তিব্বতি ভাষায় প্রার্থনামন্ত্র জপছেন। হাতের নানা মুদ্রা করছেন। বাকিরা তাঁকে অনুসরণ করছে।

পট্টনায়েক ফিসফিস করে বললেন, 'থার্ড রোয়ের এদিক থেকে

ফিফ্‌থ জনকে দেখেছেন?'

জগুমামা মাথা নাড়লেন।

'কী করবেন ভেবেছেন?'

'ভেবেছি। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ব। আমাদের কাছে কোনও প্রমাণ নেই। ঘাড়ে কাটা দাগ অনেকেরই থাকতে পারে।'

ঢং...ঢং...ঢং। সর্বাধ্যক্ষ উঠে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন। দুপুরের প্রার্থনা শেষ হল।

সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। আমরা তিনজন থামের আড়ালে। জগুমামা আড়াল হয়ে বেরোনোর গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

মুণ্ডিতমস্তক লামারা ধীর পায়ে বেরোচ্ছে। সর্বাধ্যক্ষ আগেই বেরিয়ে গেছেন। আমরা সিঁড়ির ধাপের নীচে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছি। জগুমামার চোখের পলক পড়ছে না।

সেই শ্রমণটিও বেরিয়েছে। একা-একা হাঁটছে চত্বর দিয়ে। বোধহয় নিজের বাসায় যাচ্ছে।

মামা প্রায় নিঃশব্দে ছুটে গেলেন। আচমকা গিয়ে দাঁড়ালেন তার সামনে।

'হ্যাঁলো, পাঞ্চেন! হাউ আর য়ু?'

সঙ্গে-সঙ্গে সাংঘাতিক রি-অ্যাকশন!

'কেয়া?' বিস্ফারিতভাবে তাকাল ন্যাড়ামাথা লামা।

তারপরেই প্রাণপণে ছুট দিল।

মামা এতটা ভাবতে পারেননি। পুরো চত্বরে লামা শুধু নয়, কয়েকশো টুরিস্ট গিজগিজ করছে।

পাঞ্চেন সেই সুযোগটাই নিয়েছে। এর ফাঁক দিয়ে, ওর পাশ দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে।

মামার দুপাশে আমরাও ছুটছি। প্রাণপণে। একবার কোথাও সে ঢুকে পড়লে আর পাওয়া যাবে না। এতবড় কমপ্লেক্স, এত বাড়ি, মন্দির!

টুরিস্ট, আশ্রমিকদের মধ্যে হইচই পড়ে গেছে। পাশ থেকে নানান বিস্ময়সূচক শব্দ উড়ে আসছে।

কিন্তু আমাদের কোনওদিকে চোখ নেই। একমাত্র লক্ষ্য—পাঞ্চেন।

চত্বর পেরিয়ে ধাপে-ধাপে সিঁড়ি। পাঞ্চেন সিঁড়ি দিয়ে নামছে তরতর করে। পাহাড়ি লোক। ওরা যত দ্রুত পারে, আমরা পারব কী করে?

ক্রমশ দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। সিঁড়ি নেমে গেছে অনেক নীচে। তারপরে খানিকটা সমতল, দু-চারটে বাড়ি। তারপর রাস্তা তিন ভাগ হয়ে গেছে।

পাশ দিয়ে একটা তিরতিরে ঝরনার মতো জল ঝরছে। সিঁড়ি ভিজে। যে-কোনও মুহূর্তে পা পিছলে যেতে পারে।

পাঞ্চেন অনেক নীচে চলে গেছে! আর বোধহয় ওকে ধরা যাবে না।

মামা সটান দাঁড়িয়ে পড়লেন। কোমর থেকে রিভলবার বের করে চিৎকার করে উঠলেন, 'স্টপ! অর আই'ল শ্যুট য়ু।'

কী করছেন মামা? ধর্মস্থানে রক্তারক্তি হবে? তারপর? এরা আমাদের ছেড়ে দেবে?

মামা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করলেন—'দ-ন্-ন্!'

ফের চেঁচিয়ে উঠলেন, 'স্টপ! স্টপ!'

দুটো গর্জন একসঙ্গে কাঁপিয়ে দিল চতুর্দিক।

ছোট হয়ে যাওয়া পাঞ্চেন দুহাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মামা আবার চেঁচালেন, 'একটুও নড়বে না। নড়লেই গুলি করব। সর্বাধ্যক্ষকে সব বলা আছে। য়ু আর আন্ডার অ্যারেস্ট। পট্টনায়েক, ওকে ধরে নিয়ে আসুন। আমরা দাঁড়াচ্ছি।'

মিনিট তিনেক লাগল পাঞ্চেনকে নিয়ে ওপরে উঠতে। তার লামার পোশাক খুলে মাটিতে লুটোচ্ছে। ওপরের উঠোন থেকে অনেক মানুষ এই অভিনব দৃশ্য দেখছেন। তাদের মধ্যে লামারাও আছেন।

কিন্তু এ অবস্থা বেশিক্ষণ চলল না। বড়জোর দু-তিনমিনিট। ছোপছোপ পোশাকের ফৌজিরা এসে হাজির হয়ে গেছে। তারা হাতজোড় করে সবাইকে চলে যেতে বলছে।

ওপরে লোকজন ফাঁকা হয়ে গেল।

'তারপরে পাঞ্চেন! ভেবেছিলে লুকিয়ে পার পেয়ে যাবে?'

পাঞ্চেন এখনও হাঁফাচ্ছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কোনও জবাব দিল না।

'কী হল? এবার কী হবে?'

এবারও পাঞ্চেন জগুমামার কথার কোনও জবাব দিল না।

'চুপ করে কি পার পাবে? পুলিশের ডোজ পড়লে সব হুড়হুড় করে বেরোবে।'

'কী বেরোবে?' পাঞ্চেন কটকট করে বলে উঠল, 'আপনারা কীসব আজেবাজে কথা বলছেন! আমি লুকিয়ে আছি, কে বলল? আমি শান্তির জন্যে মণিপদ্মের চরণে আশ্রয় নিয়েছিলাম।'

'শান্তির জন্যে? খুন করে শান্তি পেতে এসেছিলে?'

'খুন? কী বলছেন আপনারা? কাকে খুন করেছি?'

'কাকে খুন করেছ জান না? বোকা সাজার ভান করে কোনও লাভ নেই পাঞ্চেন। প্রোফেসর নরবুর খুনের দায়ে পুলিশ-আর্মি তোমায় খুঁজছিল। তুমি লুকিয়ে ছিলে এখানে।'

'প্রোফেসরকে আমি খুন করেছি? প্রমাণ করতে পারবেন?'

'সাক্ষী আছে। আই উইটনেস।'

'বাঃ! কেউ বলল, অমনি আমি খুনি হয়ে গেলাম। দেশে কি আইনকানুন নেই? আমি প্রফেসরকে খুন করবই বা কেন?'

'ওনার আবিষ্কার নিজের নামে চালাবে বলে।'

'প্রোফেসরের আবিষ্কার? আমি ও ব্যাপারে বিশেষ জানিই না। অদ্দূর লেখাপড়া করিনি, উনি একটা বিশেষ জাতের 'জিনসেং' গাছ আমাদের দিয়ে কালেকট করাতেন। তারপর সেটা নিয়ে কী গবেষণা করতেন, জানি না। বলতেন, মানুষের খুব উপকার হবে। দেশের নাম হবে। আমরাও সেটা বিশ্বাস করতাম, এই পর্যন্ত। ব্যস।'

'তাহলে উনি খুন হলেন কেন?'

'খুন? উনি খুন হয়েছেন কে বলল? হ্যাঁ, আমাদের চোখের সামনে হঠাৎ উনি মরে গেলেন। জং ফল্‌স-এর পাশে একটা স্পট থেকে গাছ কালেকশানে গেছিলাম। ওনাকে মারা যেতে দেখে খুব কষ্ট হল। তাই চলে এসেছিলাম এখানে। জানতাম, আপনারা পুলিশের লোক এই নিয়ে শুধু-শুধু টানাহ্যাঁচড়া করবেন। তাই।

'শুধু-শুধু? তুমি কী বলছ, নিজেই জান না পাঞ্চেন। প্রোফেসর নরবু

খুন হয়েছেন, আমরা প্রথমে বলিনি। বলেছে তোমার নেক্সট বস কর্মা শেরিং।'

'কর্মা! কর্মা বলেছে?'

'হ্যাঁ। এও বলেছে, তুমি একটা ওষুধ খাইয়ে দিয়েছ প্রফেসরকে। ওনার খুব আন-ইজি লাগছিল। তারপরেই ওনার কাগজপত্র নিয়ে তুমি পালিয়ে গেছ!'

পাঞ্চেন স্থিরচোখে তাকিয়ে আছে।

'আমরা তোমাদের দুজনের কারও ফোনে না ধরতে পেরে ড্রাইভারের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানি যে, তোমরা ওই জায়গায় গেছ। ফোর্স নিয়ে যখন পৌঁছোই, দেখি বেচারি কর্মা একা। প্রফেসরের ডেডবডির সামনে। কর্মা আমাদের সব বলেছে। এবার বলো, তুমি খুনি না নির্দোষ?'

পাঞ্চেন চুপ করে রইল কয়েকমুহূর্ত। তারপর বলল, 'দেখুন সায়েব, প্রফেসর আমায় ভালো টাকা দিতেন। আমি খুন করতে যাব কেন? আমি যদি এর উলটোটা বলি, তাহলে কী হবে? আপনারা শুনবেন?'

'বলো। শুনে আমরা বিচার করব।'

পাঞ্চেন গড়গড় করে বলে গেল।

মামা মাথা দোলালেন, 'হুঁ, চলো।'

তারপরেই ফোনের বোতাম টিপতে শুরু করলেন।

'হ্যালো। কর্মা শেরিং?...শুনুন, এইমাত্র পাঞ্চেন গোমবুকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।...তাওয়াং মনাস্ট্রি থেকে। লুকিয়েছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ।...আপনি ছ'টা নাগাদ আমাদের গেস্ট হাউসে চলে আসুন।...হ্যাঁ, আপনার আই-উইটনেস রেকর্ড করা হবে।...হ্যাঁ, যা পানিশমেন্ট হওয়ার তো হবেই। সে নিয়ে ভাববেন না।...'

এরপরেই আরেকটা ফোন করলেন।

'মিস্টার রামঅবতার সিং? ডক্টর মুখার্জি স্পিকিং। চিনতে পেরেছেন? ...থ্যাঙ্কিউ ভেরি মাচ। আপনার অ্যাডভাইসমতো তাওয়াং মনাস্ট্রি থেকে পাঞ্চেন গোমবুকে ধরা গেছে। হ্যাঁ, আমাদের কাস্টডিতেই থাকছে। কে? হ্যাঁ, পেমাও আছে।...আজ ইভনিং ছ'টায় গেস্ট হাউসে আমরা বসছি।...

আপনি চলে আসুন। ডিসকাস করব।...না, ভিসেরা রিপোর্ট নরম্যাল। আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। বাকি রিপোর্টগুলোও পেয়ে যাব। হয়তো এতক্ষণে এসেও গেছে।...হ্যাঁ, আমরা এখন মনাস্ট্রিতে।...বাই।'

৯

'ওয়াহ্! পাঞ্চেন! বহোৎ দিনোকে বাদ। ইতনা দিন কাঁহা ছুপে থে তুম?'

পাঞ্চেন কটকট করে তাকাল। কর্মা শেরিংয়ের কথার জবাব দিল না।

'আরে ভাইয়া! কুছ তো বাতাও।...তুমকো সায়দ মালুম নেহি থা, ইয়ে পুলিশবালো কিতনে খতরনাক হোতি হ্যায়। মিট্টিকে অন্দর ভি যাও তো, ঢুঁড়কে নিকালেঙ্গে।'

'কেয়া? আপ কেয়া বোলনে চাহ্তে হ্যায়, হাঁ?' পাঞ্চেন গোমবুর চোখদুটো জ্বলে উঠেছে। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। গরগরে গলায় বলল, 'আপকো মালুম নেহি কিউ ছুপে থে হম? বোলে গা কেয়া?'

জগুমামা দ্রুত হস্তক্ষেপ করলেন। বললেন, 'প্লিজ! আপনারা শান্ত হোন। আমরা আজ সকলের কথাই শুনব। যে কথা সবাই জানি না, একে অন্যকে জানাব।'

ছ'টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। বাইরে সন্ধ্যার ছায়া পড়েছে। আলোর ফুলকি জ্বলে উঠছে পাহাড়ে।

তাওয়াং গেস্ট হাউসের ড্রইংরুমে একে-একে সবাই এসে জড়ো হচ্ছেন।

পট্টনায়েক, অনন্তবাবু, কর্মা, পেমা এসে গেছেন। এইমাত্র আর্মি প্রহরায় এসে বসল পাঞ্চেন গোমবু।

'নমস্তে সিংজি।...গুড ইভনিং বিক্রম।'

পরপর ঢুকলেন রামঅবতার সিং এবং বিক্রম পচনন্দা। কেয়ারটেকার মহিলা ও তার মেয়ে সেন্টার টেবিলে কাপ, চায়ের পট, বিস্কুট রেখে গেল। একজন ফৌজি চা ঢেলে সার্ভ করে দিল সকলকে।

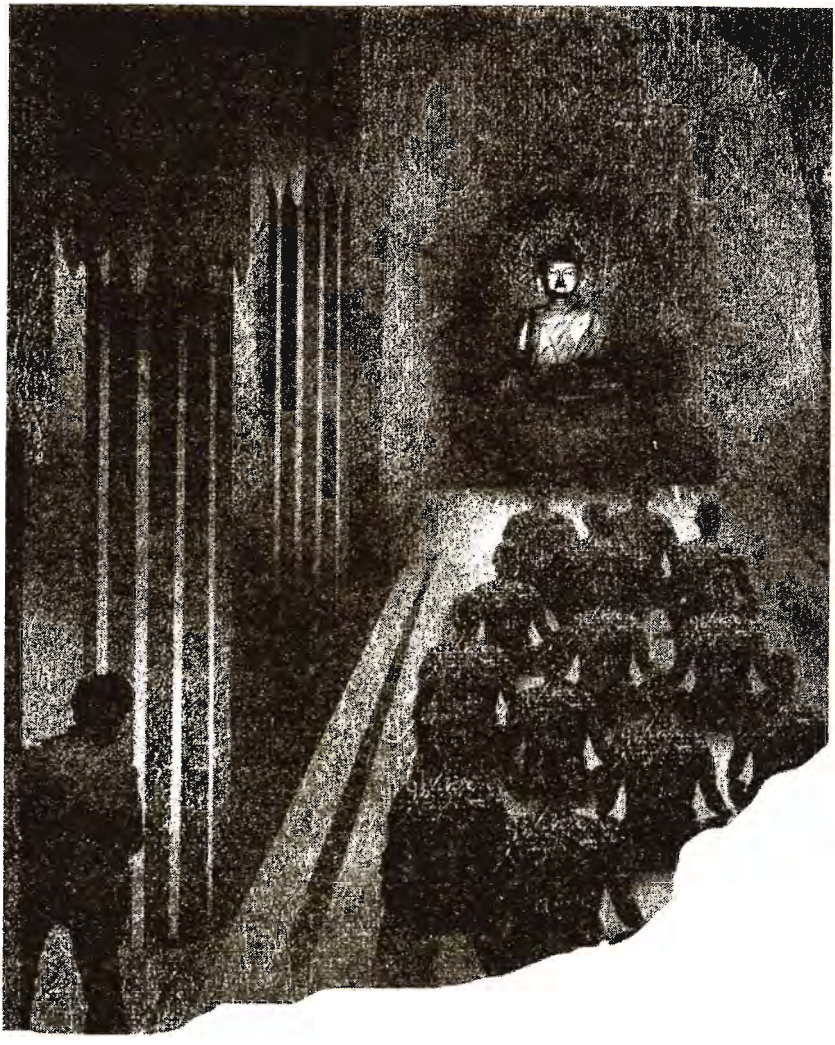

জগুমামা একটা সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'তাহলে আজকের মিটিং শুরু করা যাক। প্রোফেসর নরবুর মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সকলেই হাজির হয়েছেন। শুধু দুজন ছাড়া। একজন লোবসাং নোরগে, আরেকজন মদন তামাং।'

পট্টনায়েক জিজ্ঞাসুচোখে তাকালেন।

'লোবসাং নোরগে ফৌজি ডাক্তার, পেমার হাজব্যান্ড। মদন তামাং

টাটা সুমোর ড্রাইভার, যার গাড়িতে আমরা গুয়াহাটি থেকে আসছিলাম। দুজনেই এখন আর্মি কাস্টডিতে।'

মামা থামলেন। ঘরের মধ্যে পিন-পড়া নৈঃশব্দ্য।

'নরবুর মৃত্যুর কারণ এই গাছ।' মামা পাশের পলিথিনের মোড়ক থেকে পেমার দেওয়া গাছটা বের করলেন।

'হ্যাঁ। প্রোফেসর নরবু এই গাছ নিয়েই রিসার্চ করছিলেন। সাধারণ নাম জিনসেং। বোটানিক্যাল নেম panax pseiudoginseng। এর শিকড়ের ওষধি গুণ বা মেডিসিন্যাল ভ্যালুর শেষ নেই। শারীরিক দুর্বলতা, অবসাদ, মাথা-ধরা, বমি-বমি ভাব, ব্লাড প্রেশার কমায়, পেটে গ্যাস বের করে দেয়। এমনকী বয়েস বাড়ার অর্থাৎ aging-এর উপরেও কাজ করে। আমি আমার এক জ্যাঠাকে নিয়মিত জিনসেং-শিকড় ভেজানো জল পান করতে দেখেছি। ওনার কোনও এক বন্ধু চিনে গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এই গাছ, গুল্ম বা গাছড়া, যে নামেই ডাকুন, অসংখ্য ছড়িয়ে আছে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বিশেষত অরুণাচলের পাহাড়ে। আপনা-আপনিই প্রকৃতিতে জন্মায়। এখান থেকে আমাদের রামঅবতারজির মতো ব্যবসায়ীরা লোকাল প্ল্যান্ট-কালেকটারদের দিয়ে কালেক্ট করেন একে, অন্য মেডিসিন্যাল প্ল্যান্টের সঙ্গে। তারপর ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোকে সাপ্লাই করেন। তবে যতটা ভারতের মধ্যে যায়, তার চেয়ে হয়তো বেশিই যায় চিনে, চোরাপথে পাহাড় ডিঙিয়ে। কী বলেন সিংজি?'

'ফির ওহি বাত! আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলব না। যদি পারেন, প্রমাণ করুন।' রামঅবতার বললেন।

'আঃ! আমি কি বলেছি, আপনি চোরাচালান করেন!' মামা হাসলেন, 'যাক গে, ও কথা থাক। নরবুর রিসার্চের ব্যাপারে বলি। সেন্ট্রাল গভমেন্টের ফান্ডিং-এ নরবু এখানকার এথনো-মেডিসিন্যাল প্ল্যান্ট নিয়ে রিসার্চ করছিলেন। রিমোট ভিলেজের লোকাল ট্রাইবালরা গভীর জঙ্গল থেকে গাছ সাপ্লাই করছিল তাকে। এতে ন্যাচারালি প্ল্যান্ট ট্রেডাররা ভয় পেয়ে গেল। প্ল্যান্ট-ম্যাপিং এবং কোথায় কী পরিমাণ এরকম গাছ আছে, নরবু যদি সেটা কমপ্লিট করে ফেলেন, তাহলে গভমেন্ট সরাসরি ডিল করবে। ট্রেডারদের লাইসেন্স বা পারমিট দেবে না। অতএব

ট্রাইবাল কালেক্টরদের হুমকি দেওয়া হল, টাকাও দেওয়া হল। রাতারাতি নরবুর সোর্স-লাইন বিচ্ছিন্ন হল। সিংজি, এটা বোধহয় প্রমাণ করা যাবে। দুজন প্ল্যান্ট-কালেক্টরকে আমরা পেয়েছি।'

রামঅবতার থমথমে মুখে বসে রইলেন। কিছু বললেন না।

'কিন্তু রিসার্চ করতে-করতে প্রফেসর নরবু জিনসেং গাছের পার্টিকুলার একটা স্পিসিসে, রাদার ভ্যারাইটিস-এ এইসব গুণ ছাড়াও আশ্চর্য ক্ষমতার সন্ধান পেলেন। সেই ক্ষমতা, মানুষের শরীরের T-4 cells আবার জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা!'

'টি-ফোর সেলস্! সেটা জন্মালে কী হয়?' পচনন্দা বললেন।

'মারণ-রোগ এডস প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। এইচ. আই. ভি. অর্থাৎ হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস-এর মোকাবিলা করতে পারে। ওই ভাইরাস নিঃশব্দে টি-ফোর সেল বা কোষগুলোকে খতম করে। এডস রোগী বুঝতেও পারে না। যখন সেল-এর সংখ্যা দুশোর নীচে নেমে আসে, তখন রোগের সিম্পটমগুলো ধরা পড়ে। এডস-রোগীর কিছু করার থাকে না, মৃত্যুর জন্যে দিন গোনা ছাড়া। এই গাছের অ্যালকালয়েড আবার শরীরে তৈরি করতে পারে টি-ফোর সেল্স্।'

'ওয়হ্! গ্রেট!'

'হ্যাঁ। এই আবিষ্কারই নরবুর মৃত্যুর কারণ। আমার সঙ্গে নরবুর ফোনে যখন কথা হয়, তখন উনি হিন্টস দিয়েছিলেন। সেজন্যেই আমাদের এখানে আসা। ডিটেলসে সব জানতে পারি, ওঁর রিসার্চের এলোমেলো একগুচ্ছ কাগজ থেকে। যেগুলো খুঁজে পাই, জং ফল্সের পাশের জঙ্গলে। একটা ঝরনার পাশে। পাথরচাপা হয়ে শিশিরে-জলে অস্পষ্ট হয়ে গেছিল অনেকটা। সেখানেই নরবুর মৃতদেহ পড়েছিল।'

সকলের মুখ ভাবলেশহীন।

'এই গাছ আমরা পাই পেমার কাছ থেকে। জিনসেং গাছ অবশ্যই। কিন্তু পেমা, আপনি ভালোভাবেই জানেন, এই গাছটার বিশেষ গুণ আছে কিনা, বলা যাবে না। কারণ, জিনসেঙের যাবতীয় গুণ থাকে তার শিকড়ে বা রাইজোমে। আপনার দেওয়া গাছে কোনও শিকড় নেই। ফলে গৌহাটি য়ুনির্ভাসিটির বোটানিস্টরা কিছুই বলতে পারেননি। তবে

চিন্তার কিছু নেই। তাঁরা কাল-পরশুর মধ্যে আসছেন। জং ফল্‌সের জঙ্গলে চিরুনি-তল্লাসি চালাবেন।'

'মামা, ডেডবডির ভিসেরা রিপোর্ট কী? তাছাড়া তুমি যে—'

'বলছি। ডোন্ট বি ইমপেশেন্ট!' জগুমামা আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রফেসর নরবুর মৃত্যু কীভাবে ঘটেছিল, সেইটা নিয়েই আমরা আলোচনায় আসছি। না টুকলু, ভিসেরা রিপোর্ট অ্যাবসলিউটলি নরম্যাল। শরীরের মধ্যে কোনও ফরেন এলিমেন্ট বা পয়জন পাওয়া যায়নি। অথচ আমরা কর্মা শেরিংয়ের কাছ থেকে জেনেছি, লাঞ্চের পরে প্রফেসর নরবু আর জঙ্গলে ঢোকেননি। তাঁর হঠাৎ শরীরে আনইজিনেস হচ্ছিল। তখন পাঞ্চেন গোমবু তাঁকে একটা ট্যাবলেট খাইয়ে দেয়। প্রফেসর ছটফট করতে করতে দু-তিন মিনিটের মধ্যে মারা যান। পাঞ্চেন ওই অবস্থায় কর্মাকে রেখে পালিয়ে যায়।'

মামা একটু থেমে বললেন, 'হ্যাঁ, পাঞ্চেন পালিয়েই গেছিল। লুকিয়ে ছিল। রামঅবতার সিং-এর ইশারা বুঝতে পেরে আমরা পাঞ্চেনকে ধরে ফেলি। হ্যাঁ সিংজি, আপনি সে রাতে স্বর্ণমন্দিরের হিন্ট্‌স না দিলে, খালিস্তানি উগ্রপন্থীদের ওখানে শেল্টার নেওয়ার কথা আমরা ভাবতেও পারতাম না। তাওয়াং মনাস্ট্রি রেড করতাম না। কর্মা, আপনার কথাও ঠিক। কিন্তু—'

কর্মা হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তাহলে স্যর, আমি এখন আসি? ডিটেকশন তো কমপ্লিটেড।'

'না শেরিং। প্লিজ। অল্পেকটু বাকি আছে।'

মামা বললেন, 'আমরা পাঞ্চেনকে তাওয়াং মনাস্ট্রি থেকে যখন ধরলাম, সে খুব তর্কাতর্কি করল। সব ক্রিমিন্যালরাই ধরা পড়ার পরে যেমন করে থাকে। তাতে আমরা মাথা ঘামাইনি। কিন্তু প্রোফেসর নরবুর মৃত্যুর কারণ যেটা বলল, সেটা আমাদের স্তম্ভিত করে দিল।...কেন করে দিল, সেটা পরে বলছি। তার আগে পাঞ্চেনের মুখে সেদিনের ঘটনাটা জানতে চাই।'

'কী দরকার স্যর? ক্রিমিন্যালকে ধরার পরে তার অ্যালিবাই শুনব কেন?' পচনন্দা বললেন।

'অ্যালিবাই যদি পুরো ঘটনাটা পালটে দেয়?...পাঞ্চেন, তুমি বলো।'

পাঞ্চেন গোমবু এতক্ষণ মুখ শুকনো করে বসেছিল। মুখ তুলে সবাইকে দেখল। তারপর বলল, 'সকালে স্যারের সঙ্গে কর্মা আর আমি ফলসের পাশের জঙ্গলে ঢুকেছিলাম। জিনসেং গাছের নানা স্পেসিমেন কালেক্ট করতে। বারোটা নাগাদ কয়েকরকম কালেক্ট করে ঝরনার পাশে বসে তিনজনে লাঞ্চ করলাম। স্যর বললেন, 'তোমরা দুজনে আরেকটু ইনটিরিয়রে ঢুকে দ্যাখো, নতুন ভ্যারাইটি আর কিছু পাও কিনা। আমি একটু জিরিয়ে নিই। আধঘণ্টা পরে তোমাদের সঙ্গে জয়েন করছি।'

'আমি গাছ-টাছ বিশেষ চিনি না। কর্মা আমায় দেখাচ্ছিল, আমি শিকড়সুদ্ধু তুলছিলাম। পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে কর্মা বলল, 'ব্যস। অনেক হয়েছে। এবার চল্।'

ফিরে এসে দেখি, স্যর নাক-ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। গাছ-টাছগুলো একটা পাথরের ওপর রেখেছি। হঠাৎ দেখি, কর্মার চোখের চাউনি পালটে গেছে! পকেট থেকে একটা ইনজেকশন দেওয়ার সিরিঞ্জ আর ওষুধের শিশি বের করেছে।

আমি বললাম, 'কী হবে কর্মা ভাইয়া?'

সে বলল, 'দ্যাখ না। খুব মজা হবে।'

আমি তখনও ভাবছি, নিশ্চয়ই গাছগুলোতে কিছু পরীক্ষা করবে! কিন্তু সে সিরিঞ্জ দিয়ে ওষুধ টানল। তারপর ঘুমন্ত স্যারের পাশে পা টিপে-টিপে গিয়ে বাঁ-কাঁধে সুঁইটা ফুঁড়ে দিল।

সঙ্গে-সঙ্গে স্যর ধড়মড় করে উঠে বসলেন, 'ক্-কে? কী ব্যাপার?'

ব্যস! এটুকুই শুধু বলতে পেরেছিলেন স্যর। কয়েক সেকেন্ড পরেই স্যর 'উঃ-উঃ' করতে শুরু করলেন। খুব জোরে-জোরে নিশ্বাস টানছিলেন। বাতাস পাচ্ছিলেন না। কথা বলতে চেষ্টা করছিলেন। পারছিলেন না।

আমি ছুটে গিয়ে স্যরের পাশে বসে বুকে মালিশ করছিলাম। কিন্তু ততক্ষণে স্যর খাবি খেতে শুরু করেছেন।

চোখের সামনে ধড়ফড় করতে-করতে স্যরের শরীরটা নেতিয়ে গেল। চোখের মণি স্থির হয়ে গেল!

আমি চিৎকার করে বললাম, 'এ কী করলে কর্মা ভাইয়া?'

কর্মা বলল, 'যা করেছি, বেশ করেছি। এবার এই গাছ বেচে কোটি-কোটি টাকা আমরা রোজগার করব।'

'টাকার লোভে স্যরকে খুন করলে?'

'চুপ! একদম চুপ!' বলতে-বলতে কর্মা সাইডব্যাগ থেকে একখানা ভোজালি টেনে বের করেছে! তার চোখে খুনির দৃষ্টি। আমার দিকে তেড়ে এল, 'এবার তোর পালা! তোকেও শেষ করব। এই জঙ্গলে কেউ খবরও পাবে না।'

খুব ভয় পেয়ে গেছি। এক-পা দু-পা পেছাচ্ছি। খোলা ভোজালি হাতে কর্মা এগিয়ে আসছে।

'যা পালা! শিগগির পালা! যদ্দূর পারিস, পালিয়ে যা। পুলিশ নইলে তোকেই ধরবে। তোর কথা বিশ্বাসই করবে না!'

তখনও জঙ্গলের মুখে দাঁড়িয়েছিলাম। কর্মা চিৎকার করে তেড়ে এল, 'আজ তুই আমার হাতে মরবিই! ভালো চাস তো এখনই পালিয়ে যা। বর্ডারের ওপারে চলে যা! ইন্ডিয়ান পুলিশের হাতে পড়লে এখনই তোর ফাঁসি হবে। আমিই ফাঁসি দেওয়াব।'

খোলা ভোজালি ঘোরাতে-ঘোরাতে কর্মা ছুটে আসছে। আমার পাগল-পাগল লাগছিল! দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটলাম।...'

'লাই! ব্ল্যাটেনড লাই! ঝুট, পুরা ঝুট!' রাগে কাঁপতে-কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়েছেন কর্মা শেরিং, 'পাঞ্চেন! তোকে আমি সত্যিই খুন করে ফেলব। তুই এতবড় মিথ্যে কথা বলছিস? তোকে...'

'কুল ডাউন কর্মা। ওকে শেষ করতে দিন।...বলো পাঞ্চেন, শেষ করো।'

পাঞ্চেন থমকে গেল মুহূর্তের জন্যে।

'ঝুট কি সাচ, সে তো এই সাহাবরা বিচার করবে। আমায় বলতে বলেছে, বলছি। হ্যাঁ, ছুটতে-ছুটতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ফলসের কাছে এসেছি। ভাবছি, কোথায়? কোথায় লুকোব? সড়কে এসে পড়লাম। কোনও গাড়ি নেই। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। এই সময় দেখলাম, তিন-চারটে জওয়ান-ভরতি ফৌজি গাড়ি এসে পৌঁছল সেখানে! বুঝলাম, খবর হয়ে গেছে। কর্মা হয়তো আমার নাম বলে

দেবে। পুলিশ-আর্মি আমায় হন্যে হয়ে খুঁজবে। ঠিক ধরবে। আমার ফাঁসি হবেই।...তখন হঠাৎ মনে পড়ল, আমার এক কাকার ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। তাওয়াং মনাস্ট্রিতে সে পুরোনো লামা।...আন্ধেরা হলে পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে আমি সেখানেই পৌঁছলাম। অনেক রাতে।...কাকুতিমিনতি করলাম তার কাছে। সে রাজি হল।...পরদিন চুল কেটে ফেললাম, মন্ত্র নিলাম।...'

'কিন্তু ঘাড়ের কাছে কাটা দাগটাই তোমায় চিনিয়ে দিল।' মামা বললেন।

পাঞ্চেন মুখ নামাল।

জগুমামা বললেন, 'শুনলেন তো সব। কোন গল্পটা সত্যি? কর্মার না পাঞ্চেনের?'

'মামা, ভোজালি আর সিরিঞ্জ!'

'রাইট! মোক্ষম প্রমাণ। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি, পাঞ্চেন সত্যি কথা বলছে।'

'মানে! মানে আমি...আমি...'

'ইয়েস কর্মা। ইনজেকশনের সিরিঞ্জ আর ভোজালি দুটোই পাওয়া গেছে ডেথ স্পট থেকে। অ্যামপুল পাওয়া যায়নি। বোধহয় আপনি ঝরনার জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। সিরিঞ্জ পড়েছিল জলের ধারে। পাথরের খাঁজে। ভোজালিটাও পড়ে ছিল জঙ্গলের মধ্যে। ভেবেছিলেন, পরে এসে সব নিয়ে যাবেন। কিন্তু পারেননি। সেদিন থেকে আর্মি পোস্টিং ছিল ওখানে। পরদিন সকালে আমরা এসে তুলে নিয়ে যাই। নরবুর রিসার্চ পেপারসুদ্ধু।'

মামা দ্বিতীয় সিগারেট জ্বাললেন। লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'ভোজালিটা কাপড়ে মুড়ে নিয়ে আসি। ওতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্পষ্ট, তুলে নেওয়া হয়েছে। শেরিং-এর হাতের ছাপের সঙ্গে নিশ্চয়ই মিলবে। সেটা বিক্রমদের কাজ, ওরা করবে। আর সিরিঞ্জের মধ্যে কী কেমিক্যাল পাওয়া গেছিল, জানেন? কোনও ডাক্তার ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। মেডিকেল টার্মিনোলজিতে এর নাম—atracurium। এই কেমিক্যাল শরীরে পুশ করার দু-তিন মিনিটের মধ্যে মাস্‌লগুলো প্যারালাইজড

হয়ে যাবে। নিশ্বাসের কষ্ট শুরু হবে এবং তখনই ব্যক্তিটির হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ, তিন-চার ঘণ্টা পরে শরীরে এর কোনও চিহ্নই থাকবে না। থাকেওনি। ভিসেরা রিপোর্ট নরম্যাল।'

'ওহ্, মাই গড!' বিক্রম পচনন্দা অস্ফুটে বলে উঠলেন।

'অ্যাট্রাকিউরিয়াম কী শুধু মানুষ মারার কাজেই লাগে, ডক্টর মুখার্জি? এরকম সাংঘাতিক একটা পয়জন...'

'মোটেই নয় পট্টনায়েক। গুয়াহাটির ডাক্তাররা বলেছেন, অ্যাট্রাকিউরিয়াম ডাক্তারি চিকিৎসায়, পার্টিকুলারলি সার্জিক্যাল কেসে, যেমন অ্যানাস্থেসিয়া, মানে অজ্ঞান করতে কিংবা আর্টিফিসিয়াল রেসপিরেশন বা ভেনটিলেশনের সময়ে রোগিকে প্রয়োগ করতে হয়। নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন, এই মারাত্মক মেডিসিন বা পয়জন যাই বলুন, কোত্থেকে কর্মা পেয়েছিল।

'ল্-লোবসাং...?'

'য়ু আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট পট্টনায়েক। লোবসাং দুটো ব্যাপারে এই মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত। প্রথম, সে তার স্ত্রীকে মদন তামাং আর টুকলুর ফোন নাম্বার গোপনে সাপ্লাই করে। কর্মা শেরিং মদনকে টাকার টোপ দিয়ে আমাদের গোড়াতেই 'ফিনিশ' করার আয়োজন করে। দ্বিতীয়, অ্যাট্রাকিউরিয়াম অ্যাম্পুল এবং সিরিঞ্জ আর্মি হসপিটালের স্টোর থেকে সে পেমাকে দেয়, কর্মাকে দেওয়ার জন্যে। আগেই বলেছি, সে এখন আর্মি কাস্টডিতে। পেমাও তাই। দুজনেই সব কনফেস করেছে। এবার ট্রায়াল হবে।...আর কর্মা, তুমি যে কাজ করেছ, তাতে সত্যিই তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত। আপাতত পুলিশ-আর্মি এরাই তোমার বিচার করবে।...আজকের মিটিং এখানেই শেষ করছি।...'

পাঞ্চেন সবার আগে উঠে দাঁড়াল। তার চোখমুখ খুশি আর স্বস্তিতে জ্বলজ্বল করছে। বলল, 'আমি তাহলে যেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই যাবে। তুমি নির্দোষ। আমরাও যাব।...কিন্তু কোথায় যাবে? সত্যিই কি কোথাও তোমার যাওয়ার জায়গা আছে পাঞ্চেন?'

পাঞ্চেন থমকে দাঁড়িয়েছে। মুহূর্তে তার মুখে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এল।

'হ্যাঁ স্যর। ঠিকই বলেছেন। সত্যিই কোথাও আমার যাওয়ার জায়গা নেই। বাবা-মা-দাদা-দিদি, আমাদের পুরো ফ্যামিলি থাকে বর্ডারের ওপারে। খুব গরিব। ওই কাকাতো ভাই, যে মনাস্ট্রির লামা, ও সাত-আটবছর আগে একবার আমাদের গ্রামে গেছিল। ওর সঙ্গে আমি ইন্ডিয়ায় চলে আসি।...এটা-সেটা করে দু-বেলা খাবার জুটে যাচ্ছিল। তারপর নরবু স্যরের চোখে পড়লাম।...উনি আমায় যত্ন করে ইংরেজি শেখালেন, কত বই পড়ালেন। মানুষ করলেন। আমার একটা বাসা হল।...সব শেষ!...আমি ঠিক করেছি স্যর, মনাস্ট্রিতেই ফিরে যাব। লামা হয়েই থাকব।'

'এখনই ফাইন্যাল ডিসিশন নিও না পাঞ্চেন।' জগুমামা বললেন, 'গৌহাটি য়ুনিভার্সিটির বটানিস্টরা আসছেন, দু-একদিনের মধ্যেই। তোমাকে ওদের লাগবে। হয়তো পার্মানেন্টলি তুমি এই রিসার্চের কাজে একজন হেল্পার হিসাবে থেকে যেতে পারবে।...আমি কথা বলব।'

'তাহলে স্যর খুব ভালো হয়।'

'দেখা যাক। আর একটা কথা জেনে রাখো। তুমি হয়তো মনে-মনে রামঅবতারজির ওপর রেগে আছ। তোমার সঙ্গে তার অনেক পুরোনো সম্পর্ক। সে জানত, তুমি কোথায়! সে ইঙ্গিত না দিলে তোমায় আমরা ধরতেও পারতাম না। আর না ধরলে আই-উইটনেস এবং প্রুফ দুটোকে মেলানো যেত না। ফাঁক দিয়ে আসল ক্রিমিন্যাল বেরিয়ে যেত। সিংজি তোমার বন্ধুর কাজই করেছে। তাই না?'

'মামা, একটা প্রশ্ন। পেমা নোরগে? প্রফেসর তাকে নাকি ছোট বোনের মতো ভালোবাসতেন!'

'হ্যাঁ, বাসতেন। আর তারই সুযোগ নিয়েছিল সে। আসল অপরাধী আমাদের তৃতীয় রিপু। লোভ, টুকলু, লোভ। কর্মা শেরিং ওকে বুঝিয়েছিল, এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব দুজনের নামে হবে। প্রচুর টাকা...সব ভাগ হবে দুজনের মধ্যে। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া?'

'আরেকটা সম্পর্কও ছিল কর্মার সঙ্গে। পেমা, তুমিই বলো। সবাই সব যখন জেনে ফেলেছে, এটাই বা বাকি থাকে কেন!'

পেমা নোরগে মাথা নীচু করে বসেছিল এতক্ষণ। একটাও কথা বলেনি। আস্তে-আস্তে মুখ তুলে বলল, 'কী আর বলব...ডক্টর মুখার্জি! কর্মার সঙ্গে আমার ছোট বোনের অনেকদিনের সম্পর্ক। সামনের মাসে দুজনের বিয়ে হবে ঠিক ছিল।'

'সত্যি!' পট্টনায়েক দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কতরকম যে টানাটানি!...চলুন, একটু হাওয়া খেয়ে আসি। দম আটকে আসছে।'

'তবুও একটা রহস্য কিন্তু থেকে গেছে মামা।'

'কী রে?'

'সেলা টপ দিয়ে যখন পাস করছিলাম, কপ্টার থেকে দেখেছিলাম, সেলা লেকে কিছু একটা মুভ করছিল।...কী ওটা?'

ঠিক বলেছিস। এখনও জানা হয়নি। দূরবিনে দেখে আমার যান্ত্রিক কিছু মনে হয়েছিল ওটাকে। পাইথন নয়। সাবমেরিন জাতের। অবশ্য ভুলও হতে পারে। এটা ইমিডিয়েটলি দেখুন পচনন্দা!'

'ঠিক বলেছিস। এখনও জানা হয়নি।' পচনন্দা হাঁটতে-হাঁটতে মোবাইলের বোতাম টিপতে শুরু করেছেন।

অনন্ত সরখেল নিজের মনে বিড়বিড় করছিলেন। হঠাৎ আমাদের চমকে দিয়ে বললেন, 'তাওয়াং-এর বন্ধু, স্যার জগবন্ধু। নেই কোনও তুলনা, যেন খাঁটি সোনা!'

'আবার কবিতা!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

'ছেড়ে দে।' মামা হেসে বললেন, 'আর কোনও ভয় নেই। কাল আমরা মাধুরী লেক বেড়াতে যাচ্ছি। ওখান থেকে চায়না বর্ডার দেখা যায়।'

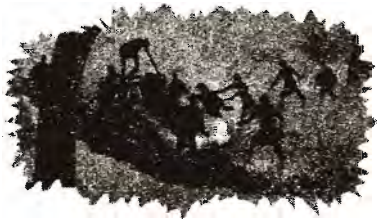

জন্ম ৩০ অক্টোবর ১৯৫৮।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এসসি।
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত **'কিশোর ভারতী'** পত্রিকায় লেখা শুরু।
প্রথম উপন্যাস **হাত**। প্রথম প্রকাশিত বই **ছায়া-মূর্তি**। ১৯৯০ সালে পুরস্কৃত হয় **অমৃতকমল** পদকে।
রহস্য ছাড়াও কল্পবিজ্ঞান এবং ইতিহাস-নির্ভর সাহিত্যে ইতিমধ্যেই পরিচিত।
পত্র ভারতী থেকে প্রকাশিত বই **জগুমামা রহস্য সমগ্র ১, ভয়ের আড়ালে ভয়, অসি বাজে ঝনঝন, জগুমামার চার রহস্য, আজও রোমাঞ্চকর, রহস্য রাতের পদ্মায়, সাক্ষী ছিলেন জগুমামা, নীল কাঁকড়ার রহস্য, রক্তরহস্য, হেরে যাবেন জগুমামা, আরবি পুথি রহস্য, রহস্যেঘেরা রাক্ষসখালি** প্রভৃতি।
সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে **সেরা সমগ্র কিশোর ভারতী** উল্লেখযোগ্য।
১৯৯৫ সাল থেকে কিশোর ভারতী পত্রিকার সম্পাদক। শিশু ও কিশোর সাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য **২০০৭ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে** সম্মানিত।

প্রচ্ছদ **সৌরীশ মিত্র**